শক্তি পীঠের সাধক

শ্রীউমাপতি ভট্টাচার্য

এস, দাশ এণ্ড কোং
৩৭/৬, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ, কার্তিক—১৩৫৭

প্রকাশক :
শ্রীসুরেশ দাশ
লেক টাউন
কলিকাতা-৫৫

প্রচ্ছদ শিল্পী :
রাজেন চক্রবর্ত্তী

মুদ্রণে :
শ্রীশম্ভুনাথ মাইতি, শ্রীনারায়ণচন্দ্র পাল
নিউ বাণী মুদ্রণ
৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

যোগীবর পণ্ডিত ৺পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের (শ্রীবৈদ্যনাথ ধাম)
ভক্তশিষ্য আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব ৺আশুতোষ
ভট্টাচার্য্য এবং পরমারাধ্যা মাতৃদেবী
৺সরোজিনীদেবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে
উৎসর্গীকৃত হইল।

কল্যাণ বাণী

পরম কল্যাণীয়—

উমাপতি বাবা,

শ্রীশ্রী৺বড়মা'র উগ্রবীজ মন্ত্র গ্রহণ করার অল্পদিনের মধ্যে তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর এবং ভাবাবেশ আমাকে মুগ্ধ করেছে। এ পথ বড় শক্ত, বড় পিচ্ছিল; পরীক্ষা নিরীক্ষার পথ, পদে পদে ধাক্কা খেতে হয়। 'নড়ি গাছটা' ঠিক করে ধরে থেকো, লক্ষ্য ঠিক রেখো—অভিষ্ঠ লাভ সুনিশ্চিত।

"শক্তি পীঠের সাধক" প্রকাশ করার বাসনা আমার বহুদিন থেকে ছিল। যখন তুমি সে ইচ্ছা প্রকাশ করলে তখন "না" বলার উপায় কি আমার রইল। তাই তো "শক্তি পীঠের সাধক" এর যাবতীয় উপকরণ, তত্ত্ব ও তথ্য তোমার মত সুযোগ্য পুত্রের হাতে দিয়ে আমি মানস লোক থেকে দায় মুক্ত হলাম।

আমার জীবনী প্রকাশ করার আগ্রহ তোমার এত কেন ?—এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাইনি। স্নেহান্ধ পিতা পুত্রের কাজে বাধা দিচ্ছে না—"সব মায়ের ইচ্ছা" বলেই মেনে নিচ্ছি। আশীর্ব্বাদ করি তমসামুক্ত হও। মাভৈঃ।

নিত্য আশীর্ব্বাদক ও চিরশুভাকাঙ্খী

শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

ভূমিকা

যাঁর করুণায় বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত, যাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে তৃণখণ্ডও স্থানান্তরিত করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, তাঁহার শ্রীচরণে ভক্তি অবনত চিত্তে প্রণতি জানাইয়া, পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের ন্যায় কার্যে ব্রতী হইয়াছি। শ্রীগুরুদেবের কৃপায়, তাঁহার বাক্যে উৎসাহিত হইয়া "শক্তি পীঠের সাধক" গ্রন্থ করিবার বাসনা আমার ন্যায় অপরিণামদর্শীর পক্ষে যে কিরূপ হাস্যাস্পদ কাজ তাহা উপলব্ধি করিয়াও শ্রীগুরুদেব ও করুণাময়ীর কৃপা ভরসা করিয়া অগ্রসর হইতে প্রেরণা পাইলাম।

পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব সারাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এই শক্তি পীঠের যে সকল মূল্যবান তথ্য, অমূল্য হস্তলিখিত পুঁথি ও সুপ্রাচীন চিঠি পত্র, বিখ্যাত ভট্টাচার্য্য বংশের কুরচী সংগ্রহ করিয়া ধারাবাহিক ভাবে "বর্ধমানের ডাক" পত্রিকায় "প্রাচীন বিল্ব পত্তম বা বেলুন "—এর ইতিহাস, ও অন্যান্য যে সকল রচনা প্রকাশ করিয়াছেন সেই গুলির এবং তাঁহার সংগৃহীত নথি পত্রের সাহায্য লইয়া, তাঁহার সম্মতিক্রমে মহাপুরুষ শ্রীভৃগুরাম স্বামীকে স্মরণ করিলে "গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা" করিবার চেষ্টা করিলাম মাত্র।

এই প্রচেষ্টার ফলে মানব সমাজের সামান্যতম অংশও মহামায়ার কৃপায় অনুভূতি পাইয়া শান্তি লাভ করিলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

"শক্তি পীঠের সাধক" গ্রন্থে ভ্রম সংশোধনে সাহায্য করেছেন শ্রীশ্যামাপদ দত্ত, তৎপরে আদ্যপ্রান্ত পাঠ করে শেষ তুলি বুলিয়েছেন আমার পরম স্নেহাস্পদ বালিগঞ্জ "সাইকলজিক্যাল রিসার্চ ব্যুরোর অধ্যক্ষ ডঃ রমেশ দাশ। তাঁদের ধন্যবাদ আর কি দেব—শ্রীশ্রী৺রী মা তাঁদের মঙ্গল করুন।

পরিশেষে, "এস, দাশ এণ্ড কোং-এর সত্বাধিকারী শ্রীসুরেশ দাশ গ্রন্থখানি প্রকাশ করে, আমার প্রচেষ্টা সফল করেছে। শ্রীমান সুরেশ দীর্ঘজীবন লাভ করে সুখী হউক—এই কামনা করি।

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত
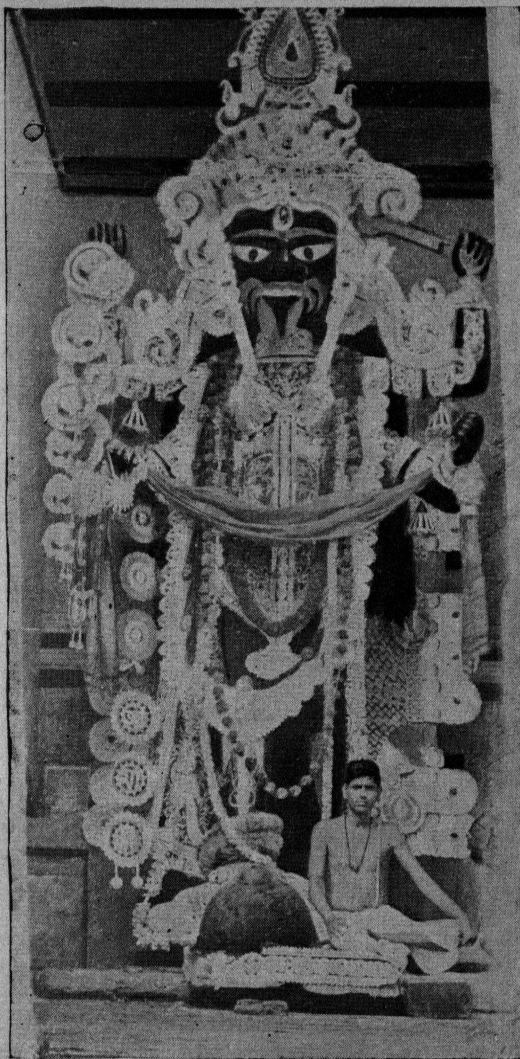
শ্রীউমাপতি ভট্টাচার্য

শক্তিপীঠের জাগ্রতাদেবী শ্রীশ্রীবুড়ামা,
পদতলে উপবিষ্ট তাঁরই সেবক শ্রীরামকৃষ্ণ
ভট্টাচার্য

বকুলা নদীর তীরে মহাসাধক
ভৃগুরামের সাধনক্ষেত্র কেতুগ্রাম
বহুলাপীঠে মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে
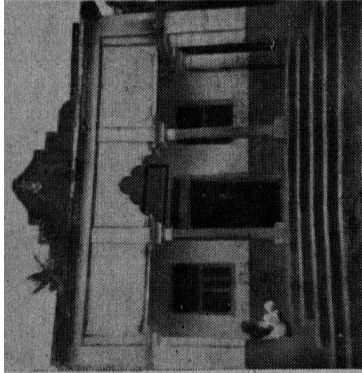
কেতুগ্রামের মধ্যে অবস্থিত বহুলা দেবীর
মন্দীর। ফঁটো—শ্রীবিপদ তারণ পাঁজা
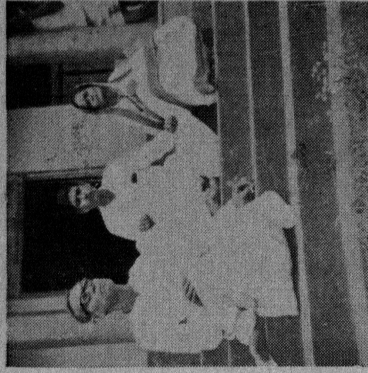
মন্দীর প্রাঙ্গনে উপবিষ্ঠ (ডান হইতে)
গুরুমাতাঅনিমা দেবী গুরুদেবশ্রীরামকৃষ্ণ
ভট্টাচার্য ও লেখকশ্রীউমাপতি ভট্টাচার্য

অবতারণা

সন ১৩৭৯ সাল। শীতের দুপুর। বর্দ্ধমান রাজ কলেজের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে বসিয়া আছি। অতীত জীবনের স্মৃতি মনে আসিতেছে। মন ভারাক্রান্ত। আর কতদিন এখানে আসিতে পারিব? দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। হায়! আর কতদিন? এবার অন্ধ হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে হইবে। বাল্যকালের স্মৃতি মনে পড়ে। পূজনীয় পিতৃদেব দৃষ্টিহীন অবস্থায় প্রায় পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন। সে কি অসহায় অবস্থা। আমিই এখন সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। আমি অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলে কি অবস্থা দাঁড়াইবে? আর চিন্তা করিতে পারি না। হঠাৎ যেন দৈববাণী শুনিলাম। কে একজন বলিলেন, "আমাদের কলেজের প্রধান করণিক তারাচরণ সেন মহাশয়ের এক পুত্র দৃষ্টিহীন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া বড় বেলুনের মা কালীর ঔষধে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে।" মন্ত্রচালিতের ন্যায় তারাচরণবাবুর নিকট ছুটিলাম। তিনি মায়ের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিলেন যে, আমি যাহা শুনিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ সত্য। তাঁহার নিকট হইতে বড় বেলুন পেঁছাইবার পথের নির্দেশ জানিয়া লইয়া পরবর্ত্তী অমাবস্যার দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে জানিতে পারিলাম আমার সহকর্মী অধ্যাপক শ্রীসাতকড়ি মুখার্জী মহাশয়ের বাড়ী ঐ বড়বেলুন গ্রামে। সকল কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমার বাড়ীর কাছেই বড়কালীর মন্দির এবং ওখানকার ভট্টাচার্য্য বংশের শ্রীরামকৃষ্ণ মহাশয়কেও আমি বিলক্ষণ চিনি, কিন্তু তিনি কোন ঔষধ পত্র দেন কিনা আমার জানা নাই। আমি দুই এক দিনের মধ্যেই বাড়ী যাইব। আপনি অমাবস্যার দিন প্রাতে সেখানে যাইবেন, তাঁহাকে আমি জানাইয়া আসিব।" আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। মনে মনে মায়ের কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিলাম। অমাবস্যার দিন আসিয়া পড়িল। পূর্ব রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। অতি প্রত্যুষে স্নানাদি সমাপন করিয়া বর্দ্ধমান ষ্টেশনের নিকট হইতে নাসিগ্রাম অভিমুখী বাসে উঠিয়া পড়িলাম। ভাগ্যক্রমে ঐ বাসেই সাতকড়িবাবু যাইতেছিলেন। বড়বেলুন গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে তিনি বাস হইতে নামিয়া গেলেন এবং আমাকে বলিলেন, "আমার এখানে কাজ আছে।

আপনি আর একটু পরে নামিবেন।" তাঁহার নির্দেশমত আমি বাস হইতে নামিয়া পড়িলাম এবং অচেনা গ্রাম্যপথে মায়ের মন্দিরের সন্ধানে চলিতে লাগিলাম। পথে যাইতে যাইতে নানা দেবদেবীর মন্দির চোখে পড়িল। অবশেষে আমার আকাঙ্ক্ষিত মন্দির দৃষ্টিপথে আসিতেই আপনা হইতেই মস্তক অবনত হইয়া আসিল এবং মাতৃদেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। সন্ধান করিয়া নিকটবর্ত্তী এক গৃহে কম্পিত হৃদয়ে প্রবেশ করিলাম।

দেখিলাম, সেই শীতের প্রাতঃকালে সদ্যস্নাত স্বামী-স্ত্রী পূজার আয়োজনে ব্যস্ত। পূজনীয় ভট্টাচার্য্য মহাশয় খালি গায়ে সকল আয়োজন করিতেছেন এবং তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন। উভয়কে প্রণাম করিয়া পূজার সামান্য উপকরণ যাহা আনিয়াছিলাম তাহা সম্মুখে রাখিয়া আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "এখন পূজা হোম ইত্যাদি হইবে দেখ, পরে তোমার সহিত কথা বলিব।" একে একে অগণিত নরনারী পূজার ডালি হাতে করিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূজা আরম্ভ হইল। নিবিষ্টমনে দেখিতে লাগিলাম। তিনি গৃহে পূজা সমাপ্ত করিয়া মন্দিরে পূজা করিতে গেলেন, সেখান হইতে আসিয়া পুনরায় গৃহে হোমের কাজ আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত ভক্ত বৃন্দের নামে সংকল্প করিয়া গৃহে ও মন্দিরে পূজা শেষ করিতে বৈকাল হইয়া গেল। মধ্যে মধ্যে মা সকল ভক্তবৃন্দকে চা, সরবৎ পান করাইলেন। পূজা সমাপনান্তে মা নিজের হাতে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করাইলেন।

এইবার ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রত্যেক ভক্তকে নিজ নিজ করণীয় বিষয় জানাইলেন। আমিও যেন আশার আলো দেখিতে পাইলাম। আমাকে চোখে একটি কাজল দিবার জন্য ঔষধ দিলেন এবং বলিলেন, "চোখ ভাল হয়ে যাবে, তবে একটু দেরী হবে।" আমি যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম। সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া নিয়মিত ঔষধ ব্যবহার করিতে লাগিলাম এবং মায়ের কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। অল্প দিনের মধ্যেই দৃষ্টি শক্তির উন্নতি বুঝিতে পারিলাম।

পরবর্ত্তী অমাবস্যার দিন প্রাতে যাইয়া তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা করিলাম। আমার সে প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিলেন। বহুদিন পিতৃমাতৃহীন হইয়াছিলাম, ভাগ্যক্রমে পুনরায় মাতাপিতার আদরের সন্তানের স্থান অধিকার করিলাম।

আমার পরম পূজনীয় গুরুদেব ও গুরুমাতার নিকট হইতে আমি কি অমূল্য রত্ন পাইয়াছি, তাহা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা আমার নাই। তাঁহাদের সান্নিধ্যে আসিয়া ' শক্তি পীঠের সাধক'' সম্বন্ধে যাহা জানিয়াছি তাহা সাধ্যমত পাঠক-বর্গের নিকট তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিব। এরূপ দুরূহ কার্য করিবার ক্ষমতা আমার নাই, সুতরাং পদে-পদে ভুল-ত্রুটি হইবার সম্ভাবনা। সকল প্রকার ভুলত্রুটির জন্ত পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লেখার কাজ আরম্ভ করিতেছি।

গ্রন্থকার

অতীত স্মৃতি

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥ ৪১
অথবা যোগীনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে যদি দৃশম্॥ ৪২

[গীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায়]

যোগীর কুলে যোগীর জন্ম এবং সাধকের কুলে জন্ম সাধকের। বড়বেলুন গ্রামের বিখ্যাত ভট্টাচার্য্য বংশের ইতিহাস আলোচনা করিলে শ্রীভগবানের বাণীর মহিমা প্রমাণিত হয়। বড়বেলুন গ্রাম এবং সেখানকার ভট্টাচার্য্য বংশ সম্বন্ধে কিছু জানিবার পূর্বে চলুন আমরা কয়েকশত বৎসর পিছনের দিকে যাই। কয়শত বৎসর পিছনের দিকে যাইতেছি, সুধী পাঠকবর্গ তাহা নিজেরাই স্থির করিবেন। বড়বেলুনের বড়কালী বা বুড়ামার প্রতিষ্ঠাতা সাধক ভৃগুরাম স্বামী। এখন যে ঘন বসতিপূর্ণ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম বড়বেলুন তাহা পূর্বে বিল্লপত্তনের অন্তর্গত ঘন জঙ্গল ছিল। এই জঙ্গলের পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্তে দুইটি ভগ্ন বৌদ্ধস্তূপ ছিল। জঙ্গলের পূর্বপ্রান্তে ছিল এক মহা-শ্মশান। এই শ্মশানে পার্শবর্তী গ্রাম সমূহের লোক মৃতদাহ করিতে বা মৃতদেহের সমাধি দিতে আসিতেন। "দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে অজয় নদের দক্ষিণ ভাগকে "বর্দ্ধমান দেশ" বলা হইয়াছে। উহা দেবভূমি নামে পরিচিত। "ভবিষ্যৎ ব্রহ্মখণ্ডে" বিল্লপত্তনের অন্তর্গত কতকগুলি পবিত্র স্থানের নাম উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে বেলুন নামটি পাওয়া যায়। ঐ পুস্তক অনুসারে পত্তন পরগনার অনুরূপ। বিল্লপত্তনের অন্তর্ভুক্ত পবিত্র স্থানগুলির নাম লৌহপুর, কুমার বীথিকা, এক লক্ষক, হস্তিকা অম্বিকা, ভূরিশ্রেষ্ঠিক, রাঘবটিকা, চন্দ্রপুর, বেলুন

প্রভৃতি। পরবর্ত্তী কালে বিল্লপত্তনের অন্তর্গত এই স্থানের নাম বেলুন বা বড়বেলুন হইয়াছে। প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলীর ভূর্জ পত্রে লিখিত অসংখ্য পত্রাদি সংগৃহীত আছে, তাহাতে এই স্থানের নাম বেলুন বা বড়বেলুন উভয়ই পাওয়া যায়। পুরাতন দলিল পত্রে এই স্থানের নাম আয়মাবেলুন বলিয়াও উল্লেখ আছে। "মেঘনাদ সর্দ্দার" নামক একখানি অতি প্রাচীন পুস্তক হইতে জানা যায়, হাঁড়গ্রাম হইতে নাসিগ্রাম যাইবার পথে বিল্লপত্তনের পশ্চিম দিকে এক রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। তাহার নিকট মাত্র কয়েকঘর লোকের বাস এবং অবশিষ্ট সমস্ত স্থান্ গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং তাহার মধ্য দিয়া দুর্গম পথ চলিয়া গিয়াছে। জঙ্গলের পূর্বদিকে এক মহা-শ্মশান, ঐ পুস্তকখানিতে মেঘনাদ কিরূপ সাহসী ডাকাত ছিল তাহার উল্লেখ আছে এবং জঙ্গলের দুই প্রান্তে যে দুইটি বৌদ্ধ ভগ্নস্তূপ ছিল, তাহারও উল্লেখ আছে।

বিল্লপত্তনের জমিদারী পাইয়া রাজা নারায়ণ চন্দ্র রায় যে রাজবাড়ীতে বাস করিতেন তাহার উল্লেখ ঐ "মেঘনাদ সর্দ্দার" নামক পুস্তক খানিতে আছে। রাজা নারায়ণ চন্দ্রের পরবর্ত্তী রাজাদের নাম পাওয়া যায় নাই। এখানকার শেষ রাজা ছিলেন রাজা ভোলানাথ রায়, তাঁহার পূর্ববর্ত্তী রাজা ছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। প্রাচীন বঙ্গদেশে যে সকল নরপতি মুসলমান রাজ-সরকারে রাজস্ব দিতেন না বেলুনের রাজবংশ তাহাদের মধ্যে একটি। বর্দ্ধমানের অধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্র রায় এই রাজ বংশের রাজ্য নিজ জমিদারীভুক্ত করেন।

"Jagat Ram Rai……was honoured with a farman by the emperor Aurangazeb. He was treacherously murdered in 1702 A.D., and left two sons Kirti Chandra Rai and Mitra Sen Rai. The elder brother Kirti Chandra Rai inherited the ancestral Zomindari,…Kirti Chandra was a man of bold and adventurous spirit. He fought with the Rajas

······and dispossessed them of petty kingdoms······ Kirti Chandra died in the year 1740."

[Pp 28-31, Bengal District Gazetteers, Burdwan by J.C.K.Petterson I.C.S. (Published 1910]

পূর্বে ছিল রাজ বাড়ী এখন কলাই ডাঙ্গা।
ঘর বাড়ী সব বহু আগেই গিয়াছে যে ভাঙ্গা॥

(বড় কালীমাতার আদ্য কথা)

বর্দ্ধমান মহারাজার দেওয়ান প্রাণচন্দ্র, মহারাজার আদেশে "হরিহর মঙ্গল" নামক মঙ্গল কাব্য প্রকাশ করেন। তাহা হইতে এই ক্ষুদ্র রাজ্যের বিবরণ জানিতে পারা যায়।

বুড়ামাতার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা ভৃগুরাম স্বামী। তাঁহার অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্নের প্রথমা কন্যার জন্ম পত্রিকা হইতে দেখা যায়, উক্ত কন্যা বর্তমান শকাব্দ হইতে একশত বিয়াল্লিশ বৎসর পুর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বড়বেলুনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বহু পুরাতন নথিপত্র সংগ্রহ করিয়া গুরুদেব ধারাবাহিকভাবে "বর্ধমানের ডাক" পত্রিকায় একদিকে যেমন "প্রাচীন বিল্লপত্তন বা বড়বেলুন" প্রবন্ধ প্রকাশ করেন সেইরূপ অপর দিকে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। তাঁহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বড়বেলুনের বানেশ্বর ডাঙায় যে খননকার্য পরিচালনা করেন সে সম্বন্ধে তাঁহার যে প্রবন্ধ বর্দ্ধমান জেলার মুখপত্র "শিক্ষা সমাচার" ৪র্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ৩০ শে জুন ১৯৫৭ তারিখে প্রকাশিত হয় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে বড়বেলুনের প্রচীনত্ব সম্বন্ধে কিছু ধারণা হইতে পারে।

বর্দ্ধমানকে জানুন

তাম্রযুগের ঢিবি বড়বেলুনের বানেশ্বর ডাঙা

বড়বেলুন একটি প্রাচীন গ্রাম। শাক্ত ও বৈষ্ণবের লীলাভূমি বড় বেলুন। বড়বেলুনের পূর্বে নাম ছিল বিল্বপত্তন বা বেলুন। এই গ্রামের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বহু গবেষণা এবং বহু তথ্য সংগ্রহ করেছি। প্রাচীন ঢিবি ও রাজবাড়ীর কৌল্লাল পাথর, মাটি সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছি। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কয়েকবার সরকারী সফর হয়েছে। শেষবার আসেন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হতে শ্রীযুক্ত দেব কুমার চক্রবর্ত্তী। তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা ফলবতী হয়। সরকারী অনুদানে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে তাঁর সহকর্মী কয়েকজন অফিসার পর্য্যায়ক্রমে এসে এই খনন কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্রচীন ঢিবিতে বর্ত্তমানে পরিচালিত উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে ঢিবির দক্ষিণ পূর্বে এবং মধ্যভাগে তিনটি পরিখা। উন্মোচিত হয়ে চলেছে আদি মধ্যযুগের এক সুবৃহৎ ও তাৎপর্যময় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক বিশাল দেবায়তনের ধ্বংস অবয়ব। এই দেবায়তনটি ইষ্টক নির্মিত এবং অনুমান করা যায় অন্ততঃ দুইবার অগ্নিকাণ্ডের দ্বারা এর সমৃদ্ধি ব্যাহত হয়েছে। দেবায়তনের নিম্নে দৃষ্টিগোচর হয় আরও অতীত যুগের চিহ্নাদি। এখানকার প্রাগৈতিহাসিক কৌল্লাল সমূহের মধ্যে উল্লেখ্য এক শ্রেণীর লাল কালো মৃৎপাত্র (ব্ল্যাক এ্যাণ্ড রেড ওয়ার) ও লোহিতোজ্জ্বল তৈজসপত্র যেগুলির সঙ্গে তুলনীয় বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে, নিকটবর্ত্তী পাণ্ডুরাজার ঢিবির বিভিন্ন ভূস্তরে।

প্রাচীন ঢিবিতে বর্ত্তমানে পরিচালিত উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত-হয়েছে একটি প্রাগৈতিহাসিক অধিবসতির বিভিন্ন চিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষ। ভূগর্ভের প্রায় ১৫ ফুট নিম্নে আবিষ্কৃত হয়েছে মনোরম আকৃতির ও

বর্ণোজ্জ্বল এমন সব মৃৎপাত্রের নিদর্শন ও আবাসিক কুটিরাদির লুপ্ত-প্রায় অংশ যেগুলি তাম্রযুগের এক পরিশীলিত সংস্কৃতির পরিচায়ক। বিভিন্ন তথ্যাদির উপর নির্ভর করে অনুমান করা যায়, আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্বে তাম্রযুগের এই উন্নত সভ্যতা বিরাজমান ছিল মাকড়া প্রস্তর সংশ্লিষ্ট রক্তাভ ও হরিদ্রাভ প্রান্তরে। অজয় উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার বিস্তার ছিল ব্যাপক ও ভাগীরথীর স্রোতধারা বিধৌত উপত্যকার প্রান্ত পর্যন্ত। পত্র পত্রিকায় পর্যায়ক্রমে বড়বেলুনের ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে। আমার সংগৃহীত তথ্য খনন কার্যে সাহায্য করেছে এবং নিঃসংশয়ে বাংলার বিস্মৃত ইতিহাসের উপর এই উৎখনন দ্বারা নতুন নতুন আলোকপাত করবে। বানেশ্বর ঢিবির উপর যে মন্দির আছে তার পশ্চিমদিকে বৌদ্ধস্তূপের নিদর্শন ও গুপ্তযুগের ইষ্টক পরিলক্ষিত হচ্ছে।”

প্রথম পর্যায়ে উৎখননের কার্য সমাপ্ত হইবার পর ২১শে ডিসেম্বর তারিখে “ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের” ৫৫তম অধিবেশনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের যে প্রদর্শনী হয়, তাতে প্রকাশিত তথ্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হলো।

“Recent archaeological excavations and explorations have thrown a new light not only upon Bengal in the Copper Age, but also upon the life and environments of the earliest food gatherers in the country. The pre-historic men in the Early and Middle Stone Ages have left their artefacts in the country covering the uplands containing Pleistocsne deposits. * * *

As it appears in pre-historic times West Bengal witnessed the emergence of a refined civilization whose material equipments were essentially chalcolithic in character. * * *

**There are evidences that this civilization which emerged in West Bengal in the Latter half of the 2nd millennium B.C. had contact with the pre-historic settlements of Bihar, Central India, Rajasthan, Maharastra and other district lands in the west. * * * * * *

The diggings conducted in Pondu Rajar Dhibi and at Baneswar Danga (Barabalun) in Burdwan district by the Directorate of Archaeology of the State Government have brought to light such relies which have their parallels in Egypt and in Aegaean world. * * * *"

প্রাথমিক খনন কার্য শেষ হইবার পর বিস্তারিত ভাবে খনন কার্য পরিচালনা করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট তথ্যাদি সহ অর্থ মঞ্জুরীর আবেদন করা হইয়াছে। আশা করা যায়, উক্ত খনন কার্য সম্পূর্ণ হইলে বিজ্ঞান ভিত্তিক উপায়ে যে সকল তথ্য বাহির হইবে তাহা হইতে বড় বেলুনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বহু তথ্য জানিতে পারা যাইবে এবং গুরুদেব পুরাতন পুঁথিপত্র হইতে যে সকল তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহারও সমর্থন মিলিবে।

যাহা হউক, আমরা এই প্রসঙ্গ স্থগিত রাখিয়া পরমপুরুষ ভৃগুরাম স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত করি।

শক্তি পীঠের শক্তি পূজারী
সাধক হে ভৃগুরাম।
মার আরাধনায় লভিলে সিদ্ধি
হলে পূর্ণ মনস্কাম॥
মার ইঙ্গিতে ছাড়ি গৃহাশ্রম
বিল্বপত্তনে পাতিলে আসন,—

ছড়ালে আলোক কালের চরণে—
করি অঞ্জলি দান ॥
তুমি দিয়ে গেছ চিন্ময়ী মায়ে
মৃন্ময়ী রূপে গড়ি।
যুগে যুগে তব অমর কীর্ত্তি
চলে তব পথ ধরি—
তোমারই শরণে তোমার চরণে—
মোদের লহ প্রণাম ॥

কেতুগ্রামের (প্রাচীন বহুলাপুর) সুপ্রসিদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের ভগবৎ প্রেমিক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাক নাম মহাদেব) মহাশয়ের পুত্র মহা সাধক স্বামী ভৃগুরাম বিদ্যাবাগীশ। তিনি তিকু বা ত্রিবিক্রম নামেও পরিচিত ছিলেন। শৈশব হইতেই ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। অতি অল্প সময়ে সংস্কৃত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া যৌবনের প্রারম্ভেই সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। বীরভূম জেলার বহুলা গ্রামের আগমবাগীশ বংশের এক বৈদান্তিক পণ্ডিতের সংস্পর্শে আসিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তাঁহার নিকট "তারা" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মাত্র ২০/২১ বৎসর বয়সে আহমদপুর কাটোয়া লাইনের চার মাইল দক্ষিণে কেতুগ্রামে মহাসাধক শক্তি সাধনায় লিপ্ত হন। এখানে চন্দ্রকেতু নামে এক সামন্ত রাজা বাস করিতেন। তাঁহার নাম অনুসারে এই স্থানের নাম বহুলাপুর হইতে কেতুগ্রাম হয়। এখানে সতীদেবীর বাম হস্ত পড়িয়াছিল।

॥ বহুলায়াং বামবাহুর্বহুল্যা চ দেবতা
ভীরুকো ভৈরবস্তত্র সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদায়ক।

পাল রাজাদের সময়ে নির্মিত বহুলাপুরের (বর্ত্তমান কেতুগ্রাম) বহু লক্ষ্মী মূর্তি কষ্ঠি পাথরে নির্মিত, উহার ভাস্কর্য অতি অপূর্ব। বহুলাক্ষী দেবীর ভৈরব "ভীরুক" ভূতনাথ নামে কেতুগ্রামের দক্ষিণ পূর্বে শ্রীখণ্ড গ্রামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

বহুলাপীঠ সম্বন্ধে "শিবচরিত" গ্রন্থে বর্ণনা আছে। তাহাতে দেখা

যায়, রাঢ় দেশের অন্তর্গত, ইন্দ্রাণীর নিকটবর্ত্তী রাজ্য বহুলাপুর এব বহুলাদেবীর নিকট হইতে অর্ধ ক্রোশ দূরে বকুলা নদীকূলে মরাঘাটে এই পীঠস্থান অবস্থিত। এই পীঠস্থানের নিকটেই এক মহাশ্মশান।

এই মহাপীঠে সাধক ভৃগুরাম সাধনা করিবার সময় প্রত্যাদেশ পাইয়া বেলুনের (বর্ত্তমান বড়বেলুন) মহাশ্মশানে গমন করেন।

"সাতাইশকা পরগণার সেই সিদ্ধ ঠাঁই।
ভূভারতে বেলুনের সমতুল নাই॥" [পীঠমালা]

বেলুনের মহাশ্মশানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন স্থাপন করিয়া বহুলাপুর হইতে আনীত এক প্রস্তর মূর্তি ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া ভৃগুরাম স্বামী জয়তি মূর্ত্তির তপস্যা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার আরাধ্যা দেবীর নাম মহানন্দা, বহুলাক্ষী, দেবী চামুণ্ডা, বড়মা বা বুড়া মা। কুব্জিকাতন্ত্রে মহানন্দার কাহিনী আছে। শিবচরিত গ্রন্থে বড়মা বা বুড়া মা নামকরণ হইয়াছে বহুলাক্ষী ও দেবী চামুণ্ডা।

বেলুনের গভীর জঙ্গল পূর্ণ মহাশ্মশানে মহাপুরুষ ভৃগুরাম স্বামী যে সময় সাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন, সেই সময় ডাকাত দল ঐ মহাশ্মশানে কালীপূজা করিয়া ডাকাতি করিতে বাহির হইত। ঐ ডাকাতদলে ভগবৎ প্রেমিক শ্রীগণেশ চন্দ্র রায় অন্তর্ভুক্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এক রাত্রে ভৃগুরাম স্বামী ধ্যানমগ্ন অবস্থায় আছেন, এমন সময় ঐ ডাকাতদল তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলে মহামায়ার প্রভাবে তাহাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাহারা মহাপুরুষের নিকটবর্ত্তী স্থানে পৌঁছিয়া আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া হঠাৎ যে যেভাবে ছিল সেই অবস্থায় স্থির ভাবে থাকিতে বাধ্য হয়। যথাসময়ে মহাপুরুষের ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারেন।

"মহাবলে মহোৎসবে মহাভয় বিনাশিনী।
ত্রাহিমাং দেবী দুষ্প্রেক্ষ্য শত্রুণাং ভয় বর্দ্ধিনী॥"
[দেবী কবচ]

পরে মহাপুরুষের কৃপায় তাহারা জ্ঞান ফিরিয়া পাইলে চোয়াডাঙ্গা হোসেন পুর নিবাসী উক্ত গণেশ রায় অকপটে সকল অপরাধ স্বীকার

করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করেন। মহাপুরুষগণ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন মানবের উদ্ধারের জন্য। সুতরাং তাঁহারা সকল সময়ই অপরিণামদর্শী জীবকে ক্ষমা করিয়া মুক্তির পথ দেখাইয়া দেন। এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না।

"কৃত্বা পাপংহি সন্তপ্য
তস্মাৎ পাপ্য প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি
নিবৃত্ত্যা পুয়তেতু সঃ॥" [মনু ২২৬]

মহাপুরুষ ভৃগুরামস্বামী গণেশকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন এবং তিনিও মাতৃ দর্শনলাভ করিয়া জন্ম সার্থক করেন। ভাগ্যবান গণেশের বংশধরেরা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কালী মাতার পূজা ও নিত্যসেবা আজও করিয়া আসিতেছেন।

এই শক্তি পীঠে স্বামীজি প্রতি অমাবস্যা, অষ্টমীতিথিতে এবং শনি ও মঙ্গলবারে বিশেষ পূজা ও পুরশ্চরণ করিতেন।

গণেশ রায়ের উল্লিখিত ঘটনা ঘটিবার পর চারিদিকে মহাপুরুষের অলৌকিক ক্ষমতার কথা প্রচার হইয়া গেল এবং বহু নরনারী তাঁহার সন্নিকটে আসিতে লাগিলেন। তিনিও তাঁহাদের বহু দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা করিলেন এবং অনেককে চির শান্তির পথ দেখাইয়া দিলেন।

বড় বেলুনের রাজ বংশের রাজা নারায়ণ চন্দ্র রায় বিল্লপত্তনের ভীষণ জঙ্গল অনেকটা পরিষ্কার করিয়া রাজ বাড়ীর সংলগ্ন স্থানে কিছু লোক বসতি স্থাপন করান। জঙ্গলের মহাশ্মশান অংশের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। তিনি রাজবাড়ীর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর ও তিন দিকে গড়খাই খনন করাইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে গড়ের কিছু কিছু অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ছোট বড় কয়েকটি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন —নারায়ণ দিঘী, চন্দ্রপুকুর, পতন সায়র প্রভৃতি। রাজবাড়ীর সংলগ্ন যে বড় পুষ্করিণী তিনি খনন করাইয়াছিলেন, কালক্রমে উহা মজিয়া যায়। পরবর্ত্তী সময়ে বড় বেলুন গ্রামের চৌধুরী বংশের জগন্নাথ

(দে সরকার) চৌধুরী উক্ত পুষ্করিণীর সংস্কার করাইয়া গ্রামের লোকের জলকষ্ট দূর করেন। ঐ পুষ্করিণীর বর্তমান নাম 'সরকার পুকুর' বা বড়পুকুর।

মাহাসাধক ভৃগুরামস্বামী গভীর জঙ্গলের মহাশ্মশানে "তারা" "তারা", বলিয়া বিকট চিৎকার করিতেন। এক কার্ত্তিকের অমাবস্থার দিন কারণ দিয়া মৃত্তিকা সিক্ত করিয়া এক হাত পরিমিত মাতৃমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া, তালপাতার তৈরী ছাউনির মধ্যে মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া সন্ধ্যার পর স্নানের নিমিত্ত বাহির হন। স্নানাদি সমাপনান্তে মহাশ্মশানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন, তালপাতার ছাউনি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে, এবং মৃন্ময়ী মূর্ত্তি ভীষণাকার সুউচ্চ চিন্ময়ী মূর্তিতে রূপান্তরিত হইয়া দোলায়মান।

শ্মশানবাসী, নির্ভীক, তেজস্বী, মহাপুরুষের দেহ ভয়ে কম্পিত এবং বাকশক্তি রহিত অবস্থায় ক্ষণকাল কাটিবার পর তিনি মূর্ত্তির সম্মুখে অগ্রসর হইয়া করজোড়ে মহামায়ার স্তব আরম্ভ করিলেন। মহামায়া মহাপুরুষকে জানাইয়া দিলেন, তাঁহার ঐরূপ বৃহৎ মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করিতে হইবে।

মহাশ্মশানে ভৃগুরাম স্বামী শয়নে, স্বপনে, জাগরণে মা ছাড়া থাকেন না। মায়ের সহিত তাঁহার নিত্য সম্বন্ধ। এক গভীর নিশীথে ভৃগুরাম নিদ্রাভিভূত আছেন, এমতাবস্থায় "বুড়া মা" তাঁহার শিয়রে বসিয়া বলিতেছেন,—"ভৃগু তুই কি করবি ?"

"বরদাহং সুরগণা বরং যং মন সেচ্ছে থ।
তং বৃনধ্বং প্রয়চ্ছামি জগতামুপকারকম্॥

[শ্রীশ্রীচণ্ডী]

ভৃগুরাম উত্তর করিলেন, "মা, তুই আমার সব। তুই যা করাবি আমি তাই করব। "রক্তবর্ণা, ললাটে চন্দ্রভূষণা, পট্টবস্ত্র পরিহিতা, নানা অলঙ্কার শোভিতা, বরাভয়করা, কোটীচন্দ্রবৎ জ্যোতির্ময় বদনযুক্তা নারীরূপে আদ্যাশক্তি ভবানী ভৃগুকে আদেশ করিলেন—"ভৃগু, তুই বিয়ে কর। তোর অনেক বয়স হয়েছে, তুই এ দেহ ত্যাগ

করলে কে আমার নিত্যপূজা করবে ? তোর বংশধরেরা আমার নিত্য পূজা করলে, আমি তোর ঘরে বাঁধা থাকব। অমাবস্যার রাত্রে এক ব্রাহ্মণকুমারী সর্পাঘাতে মারা গেলে তাকে এই মহাশ্মশানে আনবে, তার মুখে চিতা ভস্ম দিলে সে বেঁচে উঠবে।" এই বলিয়া মা অন্তর্দ্ধান করিলেন।

রাজা নারায়ণ চন্দ্র রায়ের একমাত্র গুরুকন্যার সর্পদংশনে মৃত্যু হইলে, অমাবস্যার নিশীথে মৃতদেহ মহাশ্মশানে আনয়ন করা হয়। স্বামীজি চিতাভস্ম মৃত ব্রাহ্মণকুমারীর মুখে দিলে উক্ত গুরুকন্যা নবজীবন লাভ করেন। পরে ভৃগুরাম স্বামী মাতার নির্দ্দেশে ৯৫ বৎসর বয়সে রাজার গুরুকন্যাকে বিবাহ করিয়া সংসারী সাজিলেন। এই সময় তিনি "বুড়া গোঁসাই" নামে অভিহিত হন। শেষ জীবনে তিনি একবার মাত্র নিরামিষ ভোজন করিতেন।

রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের পরবর্ত্তী রাজা ভোলানাথ রায় উক্ত রাজ বংশের শেষ রাজা। জানা যায়, ভোলানাথ রায়ের মেনকা নামে এক কন্যা ছিল। উক্ত কন্যার সৃজন রেজের সহিত বিবাহ হয়। ভোলানাথ রায়ের মৃত্যুর পর সৃজন রেজ রাজা হন। রাজত্ব প্রাপ্তির অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার রাজত্ব হস্তচ্যুত হয়।

স্বামীজি সংসারী সাজিলেও তাঁহার সাধনা হইতে বিচ্যুত হন নাই। অত্যাশ্রয়ী সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়া মাতৃপদ প্রাপ্ত হন।

"অসক্তং নির্ম্মলং চিত্তং সংসার্য্য পিস্ফুটম্।
সক্তন্তু দীর্ঘ তপসা মুক্ত মপ্যাতি বন্ধবৎ"

ভৃগুরাম স্বামী অলৌকিক যৌগিক ক্ষমতা বলে একই সময়ে একাধিক স্থানে অবস্থান করিতে পারিতেন। তিনি মহাশ্মশানে অবস্থান কালে ঐরূপ ক্ষমতা বলে পুরীতে অনন্তপুরী গোস্বামীর সহিত মিলিত হন। দুই মহাসাধকের অলৌকিক ভাবের আদান প্রদান হয়, ফলে ভৃগুরাম স্বামী মহাশ্মশানে আগমনের প্রায় একশত বৎসর পর অনন্তপুরী গোস্বামী বেলুনে আসিয়া মহাশ্মশানের পূর্বদিকে শ্রীশ্রী৺ গোপীনাথ জিউ ও শ্রীশ্রীরঘুনাথ জিউ প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুই

মহাসাধক বড়বেলুনকে শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধকদের লীলাক্ষেত্রে পরিণত করেন।

অনন্তপুরী বড়বেলুনে আসিয়া এক বকুল বৃক্ষ তলে বিশ্রাম করেন। সন্ধ্যা সমাগমে সাধক অনন্তপুরী তাঁহার ইষ্ট দেবের পূজাদি সাঙ্গ করিয়া বকুলতলে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীশ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রভু তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, "পুরী তুই এখানেই থাক। আমার পূজা ও সেবা এখানেই প্রতিষ্ঠা হইবে। তুই আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা কর।" এই কাহিনী অবলম্বন করিয়া জনার্দ্দন, শচীনন্দন প্রভৃতি গ্রাম্য কবিগণ অনেক গাথা ও গীত রচনা করিয়াছেন।

ভোগমালা গ্রন্থে পঞ্চতত্ব আসনের বামদিকে যে গুরুবর্গের আসনের কথা উল্লেখ আছে, তাহাতে মাধবেন্দ্র পুরী, বিষ্ণুপুরী, রঘুনাথ পুরী, কৃষ্ণানন্দ পুরী, নৃসিংহানন্দ পুরী, সুখানন্দ পুরী ও অনন্ত পুরীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

লোচন দাস ৬৪ মহান্ত বর্ণনায় শ্রীঅনন্তপুরী সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে লিখিয়াছেন—

চৌষট্টি মোহন্ত মধ্যে যত গুরুগণ।
শ্রীঅনন্তপুরী হন তাঁর একজন॥

* * * *

গোপীনাথ সেবা তিঁহ করিয়া প্রকাশ।
নাচে গায় হাঁসে কাঁদে কত না উল্লাস॥

এই বেলুনকে (বড়বেলুন) লক্ষ্য করিয়া উত্তর কালে বৈষ্ণব প্রধান অভিরামদাস "পাট পর্যটন" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"বেলুনে অনন্ত পুরীর মহিমা প্রচুর।" শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবের বহু পূর্বে বেলুনে "শ্রীকৃষ্ণ" ও "রঘুনাথ" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

অনন্ত পুরীর তিরোভাবের কয়েক শত বৎসর পরে চৈতন্য দেবের আবির্ভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বন্যায় দেশ প্লাবিত হইয়াছিল। সেই সময় বড় বেলুনের "গোপীনাথ" বিগ্রহও বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। এই খ্যাতির অন্যতম কারণ—সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে

মহারাজ মানসিংহের দান। মহারাজ মানসিংহ যখন আকবরের প্রতিভূস্বরূপ বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি এই গ্রামে বিশ্রাম করেন। শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউর মহিমায় মুগ্ধ হইয়া মহারাজ মানসিংহ দেবতার নিত্য সেবার জন্য ৪০৯ বিঘা জমি দান করেন। শুনা যায়, সম্রাট আকবর দেবকীর্ত্তির মহিমা অবগত হইয়া দেবোত্তর সম্পত্তি দান করেন। তাঁহার দানের পাঞ্জা অধিকারী বংশধরদের নিকট ছিল।

"গোপীনাথ" মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য বিষয়ে গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিজের উক্তি এবং তাঁহার রচিত কবিতা নিম্নে দিলাম।

"অনন্ত পুরীর তিরোধান উৎসবের প্রথম দিনে ভোগ দেওয়া হয়। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে ঐ ভোগ দেওয়ার পর কেহ সেখানে যান না। আমি বাংলা ১৩৫৩ সালে ঐ ভোগ দেওয়ার পর সেখানে যাই। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর একটা ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হইল, আমি চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। ভোগের স্থান অন্ধকারময় হইয়া গেল। ভাব-বিহ্বল চিত্তে লক্ষ্য রাখি ভোগের উপকরণের দিকে। ক্ষণিকে চমক ভাঙ্গে —দেখিতে পাই, তিনটি কুকুর ভোগের উপকরণের ধারে ধারে বসিয়া আছে। উপকরণ অন্তর্হিত। যিনি সাধনায় দিব্যদৃষ্টি পেয়েছেন, তিনি এদৃশ্য দেখে অভিভূত হবেন। সাধারণে যে যা বলে বলুক। আমি শুধু শ্রীশ্রীগোপীনাথ নয় শ্রীশ্রীবুড়া মাকেও যাচাই করে নিয়েছি। ভক্তের ভগবান। তাঁর উপর বিশ্বাস রেখে কাজ করে গেলে তাঁর বড় দয়াল।

প্রণমি শ্রীগোপীনাথ
সর্ব্ব দুঃখ হারী।
অনন্ত পুরীর প্রাণ ধন
তুমি হে মুরারী॥

তোমার মহিমা বর্ণিবার
ভাষা নাই মোর।
"রামকৃষ্ণের" ভক্তি অর্ঘ্য
লও আঁখি লোর॥"

সংসারী ভৃগুরাম স্বামীর তিনটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁহাদের ডাক নাম নেঙ্গুর, ভেঙ্গুর ও পীতাম্বর।

নেঙ্গুরের ভাল নাম পণ্ডিত শিবচরণ ন্যায়ালঙ্কার। তিনি ঢাকায় যাইয়া সংস্কৃত পাঠ গ্রহণ করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন। তিনি ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া কয়েকখানি পুঁথি রচনা করেন। ইনি বুড়ামার ভৈরব বা "বুড়াশিব" এবং শ্রীশ্রী৺ রঘুনাথ জিউ (নারায়ণ) প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রচিত কয়েকখানি ন্যায়শাস্ত্রের পুঁথি তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধরগণের নিকট হইতে জার্মান পণ্ডিতগণ লইয়া যান। বর্ত্তমানে যে স্থানে বড়মার মন্দির অবস্থিত সেই স্থানে বড়মার প্রথম মন্দির ইনি নির্মাণ করান। এই মন্দির বহুবার সংস্কার করান হয়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার উক্ত মাতার মন্দির পুনঃসংস্কার করেন ১২২০ সালে। মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িলে ১৩২৫ সালে স্বর্গীয় কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় উহা সংস্কার করান। ১৩৫৭ সালে মায়ের সেবাইতগণের প্রচেষ্টায় মন্দিরের অর্ধেক অংশ ভাঙ্গিয়া নব পর্যায়ে নির্মিত হইয়াছে। ১৩৩৮ সালে মায়ের নিরঞ্জনের জন্য লোহার সাগর (রথ) প্রস্তুত করান হয়। শ্রীশ্রী৺ বড়মাতা ষ্টেট সেবাইত সঙ্ঘ ১৩৭৩ সালে মাতার মন্দিরে লোহার গেট বসান। শিবচরণ ন্যায়ালঙ্কার শক্তিসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

ভেঙ্গুরের ভাল নাম পণ্ডিত শঙ্করপ্রসাদ বেদান্তবাগীশ। তিনি বেদ, বেদান্ত, ও দর্শনশাস্ত্রের খ্যাতিমান পণ্ডিত ও বাকসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি অঙ্ক শাস্ত্রের বহু বৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রক্রিয়া বাহির করেন। তাঁহার রচিত উক্ত প্রকার বহু পুঁথি তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধরগণের নিকট হইতে জার্মান পণ্ডিতগণ ক্রয় করিয়া লইয়া যান। শেষ জীবনে ইনি শক্তিসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

পীতাম্বরের ভাল নাম পণ্ডিত গোবর্ধন চূড়ামণি। ইনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন এবং অল্প বয়সেই সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইনি বহু বিভূতি প্রদর্শন করার ফলে বহু ব্যক্তি এমন কি সুদূর দ্রাবিড়ের বহু পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বহু দেবদেবীর স্তুতি রচনা করিয়াছিলেন এবং "মহাদেব" নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রচিত পুঁথি সকলের অনেকগুলিই পরবর্ত্তী সময়ে জার্মান পণ্ডিতগণ ক্রয় করিয়া লইয়া যান। জানা যায়, তাঁহার কোন সন্তানাদি ছিল না।

সাধক ভৃগুরাম ১৩৫ (একশত পঁয়ত্রিশ) বৎসর বয়সে তাঁহার বিশেষ অনুগত শিষ্য গণেশ রায় মহাশয়ের সাহায্যে "গোঁসাই গড়িয়া" নামক পুষ্করণী খনন করান। ঐ পুষ্করিণী যে দিন প্রতিষ্ঠা করা হয় সেইদিন রাত্রে স্বামীজী তাঁহার পুত্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "আগামীকাল অমাবস্যা, প্রাতে আমি এ দেহ ত্যাগ করিব।" পুত্রগণ, "আমাদের কি হইবে, আমাদের কি হইবে?" বলিয়া বিচলিত হইলে, মাভৈঃ" বাণী উচ্চারণ করিয়া বুড়ামার পূজা পদ্ধতি তাঁহাদের জানাইয়া দেন।

বুড়ামার বা বড়মার পূজাপদ্ধতি "বড়মার আত্মকথা" হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে দেওয়া হইল।

"কার্ত্তিকের অমাবস্যায় বসি নিশি ভোরে।
ভক্তিতে পূজিবে মায়ে এই মূর্ত্তি গড়ে॥
এই মত চৌদ্দ হাত হইবে গঠন।
তন্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে করিবে পূজন॥

---

* ভাতাড় হইতে নাসিগ্রাম যাইবার পাকা রাস্তা গোঁসাই গড়িয়ার এক অংশের উপর দিয়া যাওয়ায় ১৩৬৬ সাল হইতে অবশিষ্টাংশ শালি জমিতে পরিণত হইয়াছে।

কোজাগরী পূর্ণিমায় গায়ে দিবে মাটি।
মায়ের জিহ্বা করাইবে নূতন কুলা কাটি॥
ভক্তি ভরে গড়াইবে মোর আনন্দময়ী।
মাতৃভক্ত হবে সুখী হবে সর্ব্বজয়ী॥
তিনবলি চালে মার নৈবেদ্য করিবে।
পাঁচপোয়া নবাদ মুণ্ডি তদুপরি দিবে॥
নৈবেদ্য সাজায়ে দিবে হয়ে এক মন।
সুপক্ক উৎকৃষ্ট কলা দিবে এক পণ॥
বিল্বপত্র দুর্ব্বাদল লোহিত চন্দন।
পূজাকালে দেবে মায়ে ভক্তির কারণ॥
ছাগ ও মহিষ রক্ত খর্পরে মার দিবে।
হোম ও আরতি মার কভু না করিবে॥
মশালের আলো জ্বালি দিবে পূজাকালে
রাঙ্গাজবা সাজিয়ে দেবে মার পদতলে॥
পূজা শেষে লুচি মিষ্টি মায়ে নিবেদিবে।
আমিষ খিচুড়ী অন্নে মার ভোগ দিবে॥
এইরূপে বিধিমত হয়ে ভক্তিমন।
নিশিভোরে মার পূজা করিবে সমাপণ॥
প্রতিপদে মার পূজা করিবে বিধিমতে।
হবেন শঙ্কর প্রিয়া সন্তুষ্ট তাহাতে॥
পূজা রাতে যেই ঘট করিবে স্থাপন।
কভু না করিবে সেই ঘট বিসর্জ্জন॥
সেই ঘট রাখি দিবে ঘরের ভিতরে।
করিবে নিত্য সেবা অতি ভক্তি ভরে॥
পুরাতন মায়ের ঘট বাহিরে আনিরে।
দধিকর্ম্মা পূজাআদি বিধিমত করিবে॥
উদয় হইলে তিথি ভাতৃদ্বিতীয়া।
সেইদিন বুড়ামার হইবে বিজয়া॥

বহুদিন হতে মার করিয়া সাধনা।
তবেত পেয়েছি মায়ে মিটিয়ে কামনা॥
যুগে যুগে এই মত বিধি অনুসারে।
করিবে মায়ের পূজা মোর বংশধরে॥

ভৃগুরাম স্বামী নশ্বরদেহ ত্যাগ করিবেন—এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। বহু ভক্ত শিষ্য আসিয়া স্বামীজিকে ঘিরিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, "আমাদের কি হবে? আমাদের উদ্ধারের উপায় কি?" স্বামীজী উত্তর করিলেন, "মায়ের স্মরণ লইলে, উদ্ধার হয়ে যাবে।"

পরমভক্ত গণেশ রায় স্বামীজিকে বলিল, "প্রভু, আমার কি হবে?" স্বামীজী হাঁসিমুখে উত্তর দিলেন "আমি এ অমাবস্যায় যাচ্ছি, তুই আগামী অমাবস্যায় যাবি। তোর বংশধরেরা যেন আমাদের ভুলে না যায়। স্মরণ করতে বলবি, তারাও উদ্ধার হয়ে যাবে।

পরদিন প্রাতে ভৃগুরাম স্বামী বুড়ামার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সমাধিস্থ হন। উপস্থিত সকলে ৺ মায়ের নাম কীর্ত্তন করিতে থাকে। সকলের সন্মুখে তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রাণ বায়ু বাহির হইয়া গেল। তত্ত্বজ্ঞ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাসাধক ভৃগুরাম মহাপ্রভুর জীবন ধন্য।

"স ধন্য পুরুষোলোকে স কৃতী পরমার্থবিৎ।
ব্রহ্মনিষ্ঠঃ সত্যসন্ধো যে ভবেদ্ ভুবি মানবঃ।"
[মহানিৰ্ব্বাণ তন্ত্রম্]

মহাসাধকের নশ্বর দেহ বড়মার মন্দিরের মধ্যে পঞ্চমুণ্ডি আসনের পশ্চিম দিকে সমাধিস্থ করা হয়।

ভৃগুরাম স্বামী যে পদ্ধতিতে বুড়ামার পূজা করিতেন তাহা এই বংশের পণ্ডিত কালাচাঁদ বিদ্যারত্ন মহাশয় পুঁথির আকারে লিখিয়া

গিয়াছেন। সেই পুঁথি সযত্নে রক্ষিত আছে। আজও উক্ত পদ্ধতি অনুসারে মায়ের পূজা হইতেছে।

ভৃগুরামের তিরোধ্যানের পরবর্ত্তী অমাবস্যা তিথিতে তাঁহার অনুগত ভক্ত শিষ্য গণেশ রায় দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার নশ্বর দেহ রায়বংশের কালীঘরে সমাধিস্থ করা হয়।

আজও তত্বানুসন্ধী ব্যক্তি দেখিতে পান, কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার নিশীথে বুড়ামার পূজার মধ্য দিয়া মহাপুরুষের করুণা যেন ছড়াইয়া পড়ে। ধনীর গৃহ হইতে দীনের কুটীর পর্যন্ত আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু বান্ধবের আনন্দধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে। অভাবগ্রস্থ ব্যক্তিও শ্রীশ্রী৺বুড়ী মায়ের পূজার কয়দিন কোন অভাব অনুভব করেন না। মহাপূজার নিশীথ রাত্রে যিনি মায়ের পূজা দর্শন করিয়াছেন, তিনি মহাপুরুষ ভৃগুরাম স্বামীর জাগ্রত মাতার প্রকৃত রূপ দর্শন করিতে পারেন। প্রাচীনকাল হইতে আজও মায়ের ডাকের সাজের তাবিজের সহিত প্রকাণ্ড ঝুমকো ঝুলাইয়া দেওয়া থাকে। মহিষ বলিদানের সময় মায়ের সর্ব্বাঙ্গ ঝলমল করিয়া উঠে এবং ঝুমকো সহ মায়ের প্রকৃত রূপ দোলায়মান হইলে মহিষের উপর খড়্গ পড়িবে, নচেৎ শত চেষ্টা করিলেও বলিদান হইবে না। এই বলিদান হইয়া যাইবার পর শত শত বাদ্য একসঙ্গে বাজিয়া উঠে। তৎপূর্বে কোন বাদ্য বাজে না। সকল বাদ্য একসঙ্গে বাজিয়া উঠিলে গ্রামশুদ্ধ আবাল বৃদ্ধ বণিতা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। শুনা যায়, এই বলিতে বাধা ঘটিলে ভট্টাচার্য্য বংশের ক্ষতি এবং গ্রামের লোকের অশান্তি ও মহামারী দেখা যায়। পূর্বে ভট্টাচার্য্য বংশের সেবাইতগণ ৺মায়ের পূজা করিতে করিতে পূজার উপকরণ ভক্ষণ করিতেন। বর্ত্তমানে উক্ত মহিষ বলিদান না হওয়া পর্যন্ত বয়স্ক পুরুষ ও বয়স্কা মহিলারা জলস্পর্শ করেন না।

পূজার রাত্রে ভট্টাচার্য্য বংশের ছাগবলি ও মূর্ত্তি নির্মান কারকের, সাহায্যকারীর এবং দৌহিত্র সন্তানদের বলিদান ব্যতীত অপর কাহারও বলিদান মায়ের খর্পরে হয় না। মায়ের সম্মুখে বিভিন্ন স্থানে বহু

বলিদান হইয়া থাকে। মাতার ঘট যে ছুতার মিস্ত্রী আনে তাহার বলিদানও ঐ খর্পরে হয়। পরদিন প্রাতে প্রথমে রাজার এবং তৎপরে অন্যান্য সকলের বলিদান হইতে থাকে। বর্ত্তমানে রাজার বলিদান বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন বেলা ১টার পর নূতন ঘট রত্ন বেদীতে স্থাপন করিয়া পুরাতন ঘট বাহিরে আনা হয় এবং উক্ত ঘটের দধিকর্মা হইয়া থাকে। গভীর নিশীথে বাদ্য সহ পুরাতন ঘট বিসর্জ্জন করা হয়। তৃতীয় দিনে মায়ের পূজাও পুরশ্চরণ হইয়া থাকে। এইদিন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দেশ দেশান্তরের বহু দর্শনার্থী মায়ের প্রসাদ পাইয়া থাকেন। বেলাদ্বিপ্রহরের পর দেবী মূর্ত্তি লোহার সাগরে (রথ) তোলা হয়। মায়ের বিজয়োৎসব বর্ণনা "বড়মার আত্মকথা" হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে দিলাম।

বুড়ামার বিজয়োৎসব

দুইদিন আনন্দ দান করেন অভয়া।
পরদিন আঁখিজলে হয় যে বিজয়া ॥
কাঠের গাড়ীতে পূর্বে বিজয়া হইত।
তাহাতে অনেক বাধা বিঘ্ন যে ঘটিত ॥
সেই হেতু ভৃগুবংশ দিয়ে মন প্রাণ।
মায়ের লোহার গাড়ী করেন নির্মান ॥
তৃতীয় দিবসে বেলা দুপুরের পর।
ঘর ছাড়ি উঠিলেন মা গাড়ীর উপর ॥

ইতিপূর্বে ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার দিন মায়ের নিরঞ্জন হইত। বর্ত্তমানে উহা তৃতীয় দিবসে হইতেছে।

জনশ্রুতি এই মণ্ডল বংশ এক দিনের জন্য বুড়ামার সেবাইত বলিয়া গণ্য হইতেন। বর্ত্তমানে এই মণ্ডল বংশ বলিদান লইয়া গণ্ডগোল হাওয়ায় মাতার মন্দিরে আসেন না।

গ্রামের মণ্ডল বংশের যুবা বৃদ্ধ মিলি।
ভক্তি ভরে নেয় মাকে রথ পর তুলি ॥
দুধারের হাতে মার বাঁধা হয় দড়া।
সেই দড়া ধরে থাকে গ্রামের ঘোষেরা ॥
মস্ত দুই মই থাকে মার দুই ধারে।
"অসংখ্য জনতা" টানে মায়ের রথেরে ॥
যাত্রাকালে ধূপ দীপ মায়েরে দেখায়।
থর থর কাঁপে অঙ্গ সদা মনে ভয় ॥
মায়ের খেয়ালী কথার নাহিক তুলনা।
নিশ্চিন্ত হয় সবে ছাড়িলে সীমানা ॥
যাঁদের সীমায় মা দাঁড়াইয়া যাবে।
সে বাড়ীর কোন বিঘ্ন অবশ্য ঘটিবে ॥
একবার মায়ের গাড়ী শুকনা ডাঙ্গাতে।
দাঁড়াইয়া গেল কেহ নারিল নড়াতে ॥
সকলে কহিল ডাকি বাড়ীর কর্ত্তায়।
শীঘ্র তুষ্ট কর দিয়া পূজা "বড়মায়" ॥
অবজ্ঞার হাসি হেসে কর্ত্তা ক'ন সবে।
মৃত গরু ঘাস খায়, দেখিয়াছ কবে ॥
পরদিন বৈকালে মা'র রথ চলে।
আশ্চর্য হইয়া লোকে নানা কথা বলে ॥
আসিল মায়ের রথ অতি ধীরে ধীরে।
গ্রামের পশ্চিম সীমা "বড় পুকুর" পারে ॥
মায়ের বিজয় মাল্য বিজয়ার ক্ষণে।
বৃত্তি অনুযায়ী মাল্য পায় বহুজনে ॥
বিজয়ার সেই মাল্য যার ঘরে রবে।
কভু না আপদ বিপদ তাহার ঘটিবে ॥
অপরূপ মূর্ত্তি পেয়ে হয় নিরঞ্জন।
কলিতে কালীর নাম বল সর্বজন ॥

মায়ের বিজয়া শেষে সপ্তাহ দুই গতে।
দুই ছেলে গৃহ স্বামীর পড়িল রোগেতে ॥
এক ছেলে ত্যজে প্রাণ একদিনের জ্বরে।
চেতনা পাইয়া কর্ত্তা মার পায়ে ধরে ॥
ধূম ধামে মার পূজা দিল সে তখন।
তাহাতে বাঁচিল পুত্র পাইল জীবন ॥
এমত ঘটনা বহু শুনিতে যে পাই।
পড়িলে মায়ের কোপে নিস্তার নাই ॥
রাঙাজবা বিল্ল পত্র আর গঙ্গাজলে।
তুষ্টা অতি হন মাতা রাখে পদতলে ॥
এই খানে হলো শেষ বিজয়া বারতা।
বর্ণিতে না পারি মার অপার ক্ষমতা ॥

"য এতাং ময়া শক্তিং বেদ, স মৃত্যুংজয়তি।
স পাপ্পানাং ভরতি, যোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি ॥"

[শ্রুতি]

যিনি এই ব্রহ্মস্বরূপ মহামায়াকে বিজ্ঞাত হন, তিনি মৃত্যু জয় করেন, তিনি পাপমুক্ত হন, ও অমৃতত্ব লাভ করেন।

ভৃগুরাম স্বামীর বংশধরগণের মধ্যে বহু সিদ্ধপুরুষ, পণ্ডিত, বাকসিদ্ধ মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বংশধরগণের মধ্যেও অনেক খ্যাতিমান পণ্ডিত ও সাধক আছেন, তাঁহাদের সকলের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানাইয়া পুরাতন পুঁথিপত্র এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য হইতে সংগৃহীত কয়েকজন মহাপুরুষ ও পণ্ডিতের কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া ভৃগুরাম স্বামীর বংশের অতীত ইতিহাস শেষ করিতেছি।

পণ্ডিত লক্ষণের পিতার নাম শিবরাম ন্যায়ালঙ্কার (নেঙ্গুর)। ইনি ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সাত পুত্র। শেষ জীবনে সংসার পরিত্যাগ করিয়া শক্তি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

পণ্ডিত সিদ্ধেশ্বর চক্রপানি, মকরন্দ, প্রজাপতি, রাম, শঙ্কর, বৎস, মাধব, নিধাই, নীলাম্বর, ভৈরব, উমাপতি, শশী, বশিষ্ঠ, নরাই, বাসুদেব, বৃহস্পতি, মধুসূদন, ধনকৃষ্ণ, দেবীদাস, বিপ্রদাস, ধনঞ্জয় প্রভৃতি পণ্ডিতগণের জীবনী বিশেষ কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। কিংবদন্তী আছে যে তাঁহারা সকলেই শক্তিসাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রচিত কিছু কিছু পুঁথির অংশ সংগৃহীত আছে।

পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণকান্ত ন্যায় পঞ্চাননের পিতার নাম পণ্ডিত গঙ্গেশ তর্কভূষণ। তাঁহার পাঠ্যক্রম প্রাচীন পুঁথি হইতে যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নরূপ :—

শিক্ষার ক্রম "১৬৯৯ শকাব্দা ১৭ই বৈশাখ পাঠোমারব্ধ, ১৩ই অগ্রহায়ণ সিদ্ধান্ত লক্ষণারব্ধ, ১৫ই চৈত্রাবছেদক নিরুক্তি স্তথা, শকাব্দা ১৭০০, ৬ই জ্যৈষ্ঠ সামান্যাভাবস্তথা। ২৮শে জ্যৈষ্ঠ বিশেষ ব্যাপ্তিস্তথা। ২৪শে কার্ত্তিক ব্যাপ্তি গ্রহোপায়স্তথা। ৯ই ফাল্গুন ব্যাপ্তি পরিপক্ষস্তথা। শকাব্দা ১৭০১, ২৬শে বৈশাখ সামান্যলক্ষণস্তথা। ৭ই অগ্রহায়ণ পক্ষতাস্তথা। শকাব্দা ১৭০২, ১১ই বৈশাখ পরামর্শস্তথা মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত তত্ব, ২রা অগ্রহায়ণ অবয়ব স্তথা।

তাঁহার রচিত বহু মূল্যবান পুঁথির মধ্যে কয়েকখানি পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণকান্ত ন্যায় পঞ্চাননের বৃদ্ধ পিতামহ পণ্ডিত বিশ্বনাথ বেদান্তবাগীশ ও তর্কবাগীশ। তিনি মহাসাধক ভৃগুরাম স্বামীর অধস্তন নবম পুরুষ। তাঁহার পিতার নাম শিবরাম তর্কবাগীশ। তাঁহার স্ত্রীর নাম বিশ্বেশ্বরী দেবী। তিনি "বিশ্বনাথ ও বিশ্বেশ্বর" নামক দুইটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। শিবের নিত্য সেবার জন্য বড়বেলুন মৌজায় ১০০৯ নং তায়দাদ ভুক্ত সম্পত্তি প্রদান করেন তাঁহার প্রপৌত্র মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণকান্ত ন্যায় পঞ্চানন। উক্ত শিব মন্দিরের পুরাতন ফলকর লিখিত অংশ :—

রসগ্রহ নগাব্দেতু বঙ্গীয়ে সাধনায় চ
সাধকেন শিব প্রীতিং লব্ধ কামেন শাশ্বতীং
মহামহোপাধ্যায়েন শিবোহং সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।

বেদান্ত বাগীশেনৈব শ্রীবিশ্বনাথ শর্ম্মণা
লোকানাং হিতকর্মোহি, জপ পূজা পরায়ণঃ।
তৎ প্রপৌত্রো ধার্ম্মিকবরো ন্যায় পঞ্চাননখ্যকঃ
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণকান্ত সুধী স্বয়ম্।
সেবাজ্ঞা নিধানানার্থং ভূমি দদৌ চিরায়বৈ।"

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত ন্যায় পঞ্চাননের স্বহস্তে লিখিত একখানি পত্রের তারিখ সন ১২২১ সাল ১৩ই ভাদ্র। পণ্ডিত শিবরাম তর্কবাগীশ একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। ঢাকায় জমিদারী লাভ করিয়া সেখানে দীর্ঘদিন বাস করেন। তাঁহার পিতার নাম দেবীদাস তর্কালঙ্কার। শেষ বয়সে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত অষ্টধাতু নির্মিত "শ্রীশ্রীঢাকেশ্বরী দুর্গামাতা" বড়বেলুনে লইয়া আসেন। এই দেবীর পূজার জন্য পৃথক বাড়ী ও ২৫ বিঘা জমি দান করেন।—দেবীর পূজার ভার পণ্ডিত পুরুষোত্তম দেবরত্ন কন্যা ঝাঁটুকে দিয়া যান। ঝাঁটুর কন্যা রাজলক্ষ্মীর স্বামী তারিণী বন্দ্যোপাধ্যায় বড়বেলুনে বাস করেন। কালের প্রভাবে তারিণীর পুত্র শশীভূষণ দেবীর জমি ও বাস্তু সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলেন। বর্তমানে তাঁহার কন্যা শ্রীমতীহরিদাসী দেবী (স্বামী ৺প্রমথনাথ মুখার্জী) দেবীর ছয় মাসের পালা চালাইতেছেন। বর্তমানে ঐ সম্পত্তির মাত্র সাড়ে চার বিঘা জমি নিজ নামে রেকর্ড করান আছে। বাকী ছয় মাসের পালা শ্রীশ্রীবড়-কালীমাতা ষ্টেট হইতে পরিচালনা করা হয়। শারদীয়া পূজার চারদিন যথারীতি দুর্গামাতার পূজাদি হইয়া থাকে।

পণ্ডিত গঙ্গেশ্বর তর্কভূষণ মহাশয় পিতার নাম বৈদ্যনাথ ন্যায়ভূষণ। পণ্ডিত গঙ্গেশ্বর তর্কভূষণ চণ্ডীর ব্যাখ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি মুখে মুখে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতেন। তাঁহার রচিত বহু পুঁথি ছিল। তন্মধ্যে দুইখানি পাওয়া গিয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার সন ১১২১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম পণ্ডিত বৈদ্যনাথ ন্যায়ালঙ্কার

ও ন্যায়ভূষণ। বেলুনে বর্দ্ধমান মহারাজার জমিদারীর ॥৵১৩ গণ্ডা নিষ্কররূপে তাঁহার নিকট হইতে পুরস্কার পান। ইনি ভাগবতের এক একটি শ্লোকের ১৮ রকম ব্যাখ্যা রচনা করেন। তাঁহার রচিত তিনখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। সন ১২২৬ শকাব্দ ১৭৪১ "কাশীশ্বর ও গৌরীশ্বর" নামক দুইটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বড়বেলুনে সারা ভারতের পণ্ডিত সম্মেলন হয় এবং তিনি শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হন। তাঁহার লিখিত বহু পত্র পাওয়া গিয়াছে।

যেবা ভক্তি ভরে নারায়ণে সেবে
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয়।
যম জ্বালা যায় পরমার্থ পায়
দ্বিজ কাশীনাথ কয় ॥

* * *

অন্তরীক্ষ বেদ অব্ধি নিশাকর
শকের গণনা করি।
পাঁচালি বিধান হৈল সমাপন
সবে বল হরি হরি ॥

১১২ বৎসর বয়সে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার দেহত্যাগ করেন। জমিদারির অংশও হস্তচ্যুত হয়।

বড়বেলুনের ভট্টাচার্য্য বংশের পণ্ডিত শ্রীকাশীনাথ তর্কালঙ্কার মহাশয় সম্বন্ধে তথ্য গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভাষায় নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

সময় নদীর স্রোত বাধা নাহি মানে।
বহিয়া অতীত স্মৃতি চলে লক্ষ্য পাণে ॥
ভট্টাচার্য্য বংশের হিসাব নাহি যায় পাওয়া।
কত মহাত্মা জন্মেছিলেন, কে বলিবে তাহা ॥

তাঁদের পাণ্ডিত্যরাশি করিয়া প্রকাশ।
দেহ ত্যজি মাতৃ কোলে নিয়েছে আবাস॥
ভট্টাচার্য্য বংশের মাঝে পণ্ডিত প্রধান।
কাশীনাথ নাম তাঁর অতি গুণবান॥
তাঁহার জন্মের কথা কহি এই ক্ষণে।
আশ্চর্য্য হইবে সবে সে কাহিনী শুনে॥
দেশময় ছিল যবে বর্গীর অত্যাচার।
সেই কালে পূর্ণগর্ভা ছিলেন মাতা তাঁর॥
সন্তান রক্ষা হেতু, ভীতা মাতা তাঁরি।
শ্বশুর আলয় ত্যজি, যান বাপের বাড়ী॥
পদ ব্রজে দূরপথ, চলেন একাকী।
বিপদে রক্ষার হেতু, ক'ন মাকে ডাকি॥
ওগো মা! আমি যে তোর অধম তনয়া।
কৃপাকরি কৃপাময়ী দে গো পদ ছায়া॥
পথ শ্রান্ত হয়ে তিনি, বসেন গঙ্গাঘাটে।
প্রসব যন্ত্রনা আসি ফেলিল সঙ্কটে॥
কোথা গো মা মহামায়া কর পরিত্রাণ।
স্মরেণ শ্রীবড়মায় দিয়ে মন প্রাণ॥
তখনি জন্মিল পুত্র, সুন্দর সুঠাম।
পরিচিত হন পরে, কাশীনাথ নাম॥
ভূমিষ্ঠ হলেন যেথা কাশীনাথ স্বামী।
আশ্চর্য্য ব্যাপার সেথা ঘটিল তখনি॥
সুন্দর দুই শিবলিঙ্গ, ঠেলি বালুরাশি।
উঠেন তাঁহারি পাশে স্বরূপ প্রকাশি॥
দেখি শিব লিঙ্গে মাতা ভাবেন মনে মনে।
দেবতা ছলেন বুঝি অধমার সনে॥
হে মাতঃ করুণাময়ী, তোমার সন্তানে।
বিপদে বাঁচায়ে মাগো রাখিস চরণে॥

বলেন কাতরে মাতা, বড় কালী মা'য়।
পিতৃ-সাক্ষাতের পর যাব তব ছায়॥
হইতে বাপের বাড়ী, আপন আবাসে।
ফিরেন তখন তিনি, বড় মার পাশে॥
শিশু হেরি আশ্চর্য্য, হয়ে সবে কয়।
এছেলে ত ছেলে নয়, বুঝি দেবতা নিশ্চয়॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু, শশীকলাসম।
সুন্দর সুঠাম মূর্ত্তি, কিবা মনোরম॥
দেখিতে দেখিতে পঞ্চ বর্ষ গত হল।
বালক পাড়ার টোলে, পড়িতে যে গেল॥
বিদ্যায় অদ্ভুত মেধা, তর্কে মহীয়ান।
নানা শাস্ত্রে হন শিশু, পণ্ডিত প্রধান॥
অজ্ঞান তিমির কাটি, জ্ঞান রশ্মি তাঁর।
ছড়ায়ে পড়িল এই, ভারত মাঝার॥
সুখ্যাতি ছড়াল তাঁর, সুযশ সুনাম।
বড়বেলুন বাসী পণ্ডিত, কাশীনাথ নাম॥
নানা দেশে ডাক পড়ে, পণ্ডিত সভায়।
বড় কালী নাম স্মরি, কাশীনাথ যায়॥
অদ্ভুত পাণ্ডিত্য হেরি, পণ্ডিত সকল।
মনে মনে ক্ষুব্ধ হন, যত বুধ দল॥
বর্দ্ধমান মহারাজ, ডাকি তাঁরে কন।
আপনি আমার সভায়, পণ্ডিত হন॥
আঁধার হইয়া আসে, মোর সভাগৃহ।
এ আঁধার নাশিবারে, পারিবে না কেহ॥
দয়া করি মোর সভায়, লন প্রভু স্থান।
আপনি পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ গুণবান॥
তর্কালঙ্কার প্রভু, কাশীনাথ স্বামী।
-রাজার কথায়, মত দিলেন তখনি॥

বন্দিয়া শ্রীবড়মা'র চরণ কমল।
সেই দিন হতে সভা করেন উজ্জ্বল ॥
দেশ বিখ্যাত সুধী, কাশীনাথ হন।
জিতিলেন কত তর্কে না যায় গণন ॥
ধন্য ধন্য করে সবে, তর্কালঙ্কারে।
চরণ কমল পূজে, নানা উপহারে ॥
বর্দ্ধমান মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া।
সাড়ে দশ আনা জমিদারী দিলেন ছাড়িয়া ॥
নিষ্কর সম্পত্তি প্রভু, বড়বেলুন গ্রামে।
এই আমি লিখে দিনু, আজি তব নামে ॥
ইহার মালিক হবে, তব বংশ ধরে।
ইচ্ছামত এ সম্পত্তি, পাবে ভুঞ্জিবারে ॥
শিষ্যদের বিদ্যাদান, করি অকাতরে।
মায়ের সেবায় সাধু, সঁপিলেন তাঁরে ॥
জন্মের গূঢ়তত্ব করিয়া শ্রবণ।
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিতে করেন মনন ॥
লিঙ্গ দুই আনিলেন, কাশীধাম হতে।
দেশের সকল পণ্ডিত, আনেন যজ্ঞেতে ॥
তিন দিন যজ্ঞ করেন, আনি যজ্ঞেশ্বর।
প্রতিষ্ঠা করেন পরে, ভোলা মহেশ্বর ॥
যজ্ঞ তরে পড়ে গেল নানা ধুমধাম।
আনন্দে হইল পূর্ণ, বড় বেলুন গ্রাম ॥
সেই যজ্ঞে আসিলেন এক বীর হনুমান।
মন্দিরের চূড়া ধরি, হন অধিষ্ঠান ॥
যজ্ঞ শেষে সকলে, আশ্চর্য হইয়া।
দেখে হনুমান গেছে, মন্দির ছাড়িয়া ॥
কখন কোথায় গেল, কেহ নাহি জানে।
দেবতা আসিল, বুঝি ভাবে মনে মনে ॥

মাতৃসেবায় পেলেন মার চরণে স্থান।
হে কাশী! পণ্ডিত মাঝে, তুমি মহীয়ান॥
তোমার অদ্ভুত স্মৃতি, পাণ্ডিত্য অপার।
আজিও জাগ্রত আছে, মনেতে সবার॥
তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি, এ জোড়া মন্দির।
গাহিছে তব যশ, ওগো মহাবীর॥
তোমার চরণে আজি. করি প্রণিপাত।
বড়বেলুন অন্ধকার, বিনে কাশীনাথ॥
দেহত্যজি লভিয়াছ, মা'র পাশে স্থান।
আবার এসহে ফিরে, পণ্ডিত প্রধান॥

পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত সাংখ্যরত্নঃ—পিতার নাম পণ্ডিত অভয় ন্যায়ালঙ্কার। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে।

শ্রীপাট নবদ্বীপ ধামের পণ্ডিতমণ্ডলী বড়বেলুনের পণ্ডিতমণ্ডলীকে যাচাই করিবার জন্য ৺বুড়া মাতার পূজার দিন মায়ের পূজার জন্য যবন দ্বারা এক ঘড়া গঙ্গাজল পাঠান। পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত সাংখ্যরত্নের নেতৃত্বে গোয়াল ঘরে নদীর আকারে আঁকাবাঁকা নালা কাটিয়া তাহাতে ঐজল ঢালিতে বলা হয়। স্রোতে উক্ত জল প্রবাহিত হইলে, সেই জল তুলিয়া লইয়া "জল শুদ্ধির" মন্ত্র দ্বারা শোধন করিয়া মায়ের পূজা করেন। উক্তজলে কিভাবে পূজা করা হইল তাহা ভূর্জ পত্রে লিখিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীকে জানান হয়। পরে রাস উপলক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভূর ভোগের নিমিত্ত পুঁইডাঁটা ও মুসুর ডাল পাঠাইয়াছিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী উহা আমীষ জাতীয় বলিয়া মহাপ্রভুর ভোগ দেন নাই। তৎপরে বেলুনের পণ্ডিতমণ্ডলী নবদ্বীপে সারা ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মেলন আহ্বান করেন এবং নির্দিষ্ট দিনে বড়বেলুন হইতে ১৮ জন খ্যাতনামা পণ্ডিত ঐ সম্মেলনে যোগ দেন। সেখানে ১৫ দিন তর্কযুদ্ধের পর "আত্মবৎ সেবার" যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা জয়যুক্ত হন এবং পুঁই ডাটা ও মুসুর ডাল দ্বারা

ভোগ রন্ধন করিয়া মহাপ্রভুকে উৎসর্গ করা হয়। বড়বেলুনের এই ১৮ জন পণ্ডিত ১৮ কান্ত নামে খ্যাত।

এই ১৮ কান্ত পণ্ডিতের নাম :—

(১) মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণকান্ত ন্যায়পঞ্চানন (২) শ্রীরামকান্ত বিদ্যানিধি, (৩) শ্রীচন্দ্রকান্ত সাংখ্যরত্ন (৪) শ্রীলক্ষ্মীকান্ত জ্যোতিষ-রত্ন (৫) শ্রীরতিকান্ত জ্যোতিষরত্ন (৬) শ্রীরুক্মিনীকান্ত বিদ্যারত্ন (৭) শ্রীরামকান্ত তর্করত্ন (৮) শ্রীউমাকান্ত তর্কবাগীশ (৯) শ্রীরাধা-কান্ত বাচস্পতি (১০) শ্রীকালীকান্ত দর্শনরত্ন (১১) শ্রীরমাকান্ত শিরোমণি (১২) শ্রীসূর্যকান্ত ন্যায়বাচস্পতি (১৩) শ্রীনবকান্ত ভাগবতভূষণ (১৪) শ্রীমথুরাকান্ত কাব্যবিশারদ (১৫) শ্রীবাণী-কান্ত বিদ্যাভূষণ (১৬) শ্রীবল্লভীকান্ত বিদ্যানিধি (১৭) শ্রীকমলা কান্ত বেদরত্ন এবং (১৮) শ্রীপ্রাণকান্ত বিদ্যানিধি।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন : অষ্টবিংশতি শতাব্দের খ্যাতনামা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্নের পিতার নাম পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত ন্যায়-পঞ্চানন। শৈশবে তিনি নির্বোধ ও দুরন্ত ছিলেন। তাঁহার পিতা মনের দুঃখে একদিন তাঁহাকে সুদূর মাঠে ছাড়িয়া দিয়া আসেন। বালক দিক ঠিক করিতে নাপারায় প্রখর রৌদ্রে ছুটাছুটি করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত ও ক্লান্ত হইয়া "হা ভৃগুরাম! হা ভৃগুরাম!" বলিয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। এক বৃদ্ধ তাঁহাকে এক ঘটি জল প্রদান করেন। ঐ জল পান করিয়া তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেন, কিন্তু বৃদ্ধকে আর দেখিতে পান না। ভৃগুরাম স্বামীর করুণায় ঐ বালক বাক্‌সিদ্ধ, দিগ্বিজয়ী অদ্বিতীয় পণ্ডিত হন। তিনি বহুগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে গৌর চন্দ্রামৃত, মুক্তি-দীপিকা, মনোদূতম্ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তুলট কাগজে লিখিত তাঁহার কিছু পত্র পাওয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমান মহারাজার নিকট দান স্বরূপ ৫ আনা ৭ গণ্ডা জমিদারী লাভ করেন। তাঁহার বংশধরগণের আমলে ঐ জমিদারী বিক্রয় হইয়া যায়।

কৃষ্ণকান্ত ন্যায় পঞ্চাননের পুত্রের নাম পণ্ডিত মহেশ্বর তর্কালঙ্কার। তিনি বাকসিদ্ধ সাধক ছিলেন। কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, কোন

শিষ্যকে ভুলক্রমে অমাবস্যার দিনকে পূর্ণিমার দিন বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। ভুল বুঝিতে পারিয়া রাত্রিকালে যোগবলে জ্যোৎস্নায় চারিদিক আলোকিত করিয়াছিলেন। তিনি "কারক চক্রের টীকা" রচনা করেন।

পণ্ডিত বিপ্রদাসের পিতার নাম নরাই। বিপ্রদাসের চার পুত্রের মধ্যে পণ্ডিত শম্ভুদাস বিদ্যাবাগীশ বড়বেলুনে বসবাস করেন। অপর তিন পুত্র পণ্ডিত গঙ্গাধর শিরোমণি, দেবীচরণ ও রামসুন্দর পিতার সহিতভাতার থানার অন্তর্গত আমারুনে বসতি স্থাপন করেন। বিপ্রদাস বড়বেলুন হইতে আমারুনে জয়দুর্গার মন্দিরেচণ্ডীপাঠ করিতে যাইতেন। বৃদ্ধ অবস্থায় একদিন চণ্ডীপাঠ করিয়া ফিরিবার পূর্বে বলিয়া আসেন যে, তিনি আর চণ্ডীপাঠ করিতে আসিতে পারিবেন না। ফিরিবার সময় পথিমধ্যে তাঁহাকে জয়দুর্গামাতা দর্শন দিয়া বলেন—"তুই এখানে এসে বাস কর তাহা হইলে তোর বংশধরেরা পুরুষানুক্রমে আমার পূজায় চণ্ডী পাঠ করিতে পারিবে।" বিপ্রদাস বলেন, "বেলুনের বড়মাকে ছেড়ে কি করে আসব?" তাহার উত্তরে দেবী বলেন, "তুই এখানে আমার নামে বড়মা স্থাপন কর—এই দেখ আমি সেই বড়মা।" দেবী মূর্ত্তি দেখিয়া বিপ্রদাস মূর্চ্ছিত হইয়া যান। পরে তিনি আমারুনে স্থায়ী ভাবে বসবাস স্থাপন করেন। তাঁহার জ্যৈষ্ঠ পুত্র পণ্ডিত গঙ্গাধর শিরোমণি পরে এওড়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

পণ্ডিত চন্দ্রনাথ স্মৃতিরত্ন:—গহনাগড়া অধ্যাপক নামে খ্যাত। তাঁহার পিতার নাম পণ্ডিত হরিনাথ ভাগবতভূষণ। তাঁহার স্মরণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল এবং তিনি সূক্ষ্ম কার্যে পারদর্শী ছিলেন। স্বর্ণকারের প্রস্তুত গহনা তাঁহার পছন্দ না হওয়ায় উহা তিনি নিজে পুনরায়প্রস্তুত করেন। উহার কারুকার্য দেখিয়া সকলে বিস্মিত হন এবং তিনি গহনাগড়া অধ্যাপক নামে খ্যাতি লাভ করেন।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্নের পিতা পণ্ডিত গোপীচন্দ্র ন্যায়ভূষণ খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার স্বহস্তে লিখিত কয়েকখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইনি মূল মহাভারত গদ্যে অনুবাদ করেন।

এ বিষয় তিনি বর্ধমানাধিপতি "কীর্তিচন্দ্র" বাহাদুরকে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহার অবিকল নকল নিম্নে দেওয়া হইল।

"বিবিধ বিদ্যাবিতরনজনিত যশোকণক সুধাধাম ধরণীকৃত দিগ্দিগন্তর বহুবিধদান দূরীকৃত দৈন্যজন্য বিশ্ববিরাজিত কীর্তিকান্তিকৃত ভুমণ্ডল মহামহিম মহিমার্ণব বর্ধমানাদ্যাধিপতি নৃপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ রাজচক্রবর্তী বাহাদুর প্রবল প্রতিপক্ষ পরাজিত প্রবল বলবিশিষ্ট বিশিষ্টজনগণ প্রতিপালক দীন দৈনগণজনক স্বরূপ সমীপেষু—

তাবকাল রাজ্যান্তঃপাতি বড়বেলুনাখ্য গ্রামনিবাসিনং ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যাত্মজস্য শ্রীগোপীচন্দ্র ন্যায়ভূষণস্য যথাবিহিত নিবেদন মিদং ভবতাং পরমভাগবতাং ভাবুকমনুদিনং সংচিন্ত্য ভবদীয় ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক মহামান্য বিদ্বরা গ্রাম্য শ্রীযুক্তোমাকান্ত তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য চরণ সমীপে তত প্রসাদ তোহং তর্কশাস্ত্রমধীয়ে ভবতায়তন সংগৃহীতা মহাভারতাখ্যা বৈয়াসিকী সংহিতা বুধগণ সংশোধিতা বুধগণে ভোদত্তা অধুনা নিরুক্ত সংহিতামদৃষ্ট প্রথম বনস্যমন্মন সিগ্রাহয়িত্তুং কথয়তি অতো মন্মন স্তংনেত্তং মাস্প্রত্যহনিশ মনুযোগং করোতি নিখনাশকেময়িয়দি ভবতা কৃপাং প্রক্ষিপ্য সাদীয়তে তদামনোভিলাসং পুরয়তি অহমপিঃ কৃতার্থঃ স্যামিতি প্রাবলস্য ত্রয়োদশ দিবশায়া নিবিরিয়ামিতি।

বড়বেলুনাখ্যগ্রার্মবাসিনঃ ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রতন ভট্টাচার্য্যাত্মজস্য শ্রীগোপীচন্দ্র ন্যায়ভূষণস্য নিবেদন মিদং প্রার্থনাপত্রং॥"

উক্ত মহাভারত ছাপান হয়, কিন্তু ঐরূপ কোন ছাপান পুস্তক বা তাহার পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পরবর্তী সময়ে উক্ত রাজবংশের মহারাজ মহাতাব চাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় এক পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা মহাভারতের যে অনুবাদ প্রকাশ করা হয়, তাহার সহিত এই অনুবাদ সম্পূর্ণ পৃথক। উক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রধান পণ্ডিত পরে "ক্ষীর-হরিবংশ" অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিশ্বনাথ বেদান্তবাগীশ ও তর্কবাগীশের পুত্র পণ্ডিত বৈদ্যনাথ ন্যায়ভূষণ ও বিদ্যালঙ্কার একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ও

তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তিনি বহুদিন চতুষ্পাটীতে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তুলট কাগজে লিখিত তাঁহার কয়েকখানি পত্র পাওয়া গিয়াছে।

চিরকুমার গ্রাম্য কবি শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পিতার নাম শ্রীরাম বাচস্পতি। তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতেন। সন ১২৯১ সালে বড়মার মন্দির চূড়া ভাঙ্গিয়া যায়। উহা মেরামতের জন্য চাঁদা আদায় হয় কিন্তু মন্দিরের সংস্কার না হওয়ায় শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিম্নোক্ত কবিতাটি রচনা করেন।

"বড়মা বিরাজ করেন ভাঙ্গা ঘরে বড়বেলুনে।
কুঞ্জধন কর্তা হ'ল, নেঙ্গুর বংশের লোক বিহনে॥
দালান সারা হবে বলে হায়,
বৎসর বৎসর চাঁদা চায়—
সে সব টাকা খরচ করেন, নিজ নিজ তেল লবণে।
"বড় মা" বিরাজ করেন, ভাঙ্গা ঘরে বড়বেলুনে॥"

শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় কলিকাতায় থাকাকালীন পেটের অসুখে কষ্ট পাইলে, যে কবিতা রচনা করেন তাহা নিম্নরূপ ঃ—

শ্রীশরে! তুই কলকাতায় এসে গেলি মরে।
কলকাতার এই ধাঁচাখানা,
শ্রীশ এর জানা ছিল না,
তা হলে কি আসতো হেথা—
থাকতো দেশে পাঠশাল করে॥

পণ্ডিত মহেশ্বর তর্কালঙ্কারের পুত্র নবীন সার্ব্বভৌম শক্তি সাধনায় লিপ্ত থাকিয়া বহু বিভূতি প্রদর্শন করেন। তাঁহার জন্ম ৩ রা অগ্রহায়ণ ১৭৪৪ শকাব্দ।

মহাপুরুষ ভৃগুরাম স্বামীর বংশধরগণের মধ্যে অনেকেই সংসার ধর্ম প্রতিপালন করিয়া শক্তি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

ঐ সাধনপীঠে উক্ত বংশের সকলেই সাধনায় অধিকারী কিন্তু প্রচলিত রীতি অনুসারে কার্ত্তিক অমাবস্যার নিশীথ রাত্রে ও তৎপর দুই দিন

বংশ ধারা দেওয়া হইল। ইহারা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবলা খরদহ মেল, বন্দিঘাটী গাঁই, নেঙ্গুর বংশের সন্তান।

মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়
|
ভৃগুরাম স্বামী
(ভিকু, ত্রিবিক্রম)
|
শিবচরণ ন্যায়ালঙ্কার (নেঙ্গুর) — শঙ্কর প্রসাদ বেদান্তবাগীশ (ভেঙ্গুর) — গোবর্ধন চূড়ামণি (পীতাম্বর)

শিবচরণ ন্যায়ালঙ্কার (নেঙ্গুর)
|
লক্ষ্মণ
|
প্রজাপতি
|
নিধাই
|
নরাই
|
দেবীদাস তর্কালঙ্কার
|
শিবরাম তর্কবাগীশ
|
বিশ্বনাথ বেদান্তবাগীশ
|
পণ্ডিত বৈদ্যনাথ ন্যায়ভূষণ
|
গঙ্গেশ তর্কভূষণ
|
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত ন্যায়পঞ্চানন
|
পণ্ডিত মহেশ্বর তর্কালঙ্কার
|
হারাধন ভট্টাচার্য্য
|
পার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য
|
শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বাল্যকাল

পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পণ্ডিত শ্রীশিবরাম ন্যায়ালঙ্কারের (নেঙ্গুর) অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষ, অর্থাৎ পরম সাধক শ্রীশ্রীভৃগুরাম স্বামীর অধস্তন ষোড়ষ পুরুষ। তিনি বর্দ্ধমান জেলার ভাতার থানার অন্তর্গত বড়বেলুন গ্রামনিবাসী ৺পার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। পিতা শ্রীপার্ব্বতীচরণের বৈষয়িক জ্ঞান ছিল না, ফলে তিনি পুত্র কন্যাদের জন্য তাঁহার আন্তরিক আশীর্বাদ ব্যতিরেকে ভূসম্পত্তি বা নগদ অর্থ, কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার আটটি পুত্র কন্যার মধ্যে দুই পুত্র ও এক কন্যা বর্ত্তমান। অপরাপর পুত্র কন্যা শৈশবেই প্রাণ ত্যাগ করেন। দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্টাচর্য্য সপরিবারে বড়বেলুনে বসবাস করেন। ভগিনী শ্রীবিশ্ববরণী দেবীর সহিত শ্রীনন্দদুলাল অধিকারীর বিবাহ হয় পিতামাতা বর্ত্তমান থাকিতে। তাঁহারা বর্দ্ধমান জেলার কাষ্ঠকুরুম্বায় বসবাস করেন।

শুভক্ষণে সন ১৩২৮ সালের ১৩ই বৈশাখ, মঙ্গলবার রাত্রি ১১টা ৯ মিনিটে বর্দ্ধমান সদর থানার অন্তর্গত কুরমুন অঞ্চলের দেবগ্রাম পল্লীনিকেতনে মাতুলালয়ে গুরুদেবের জন্ম হয়। মাতা শ্রীবিভাবতী দেবীকে তাঁহার পিতা ৺অবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি ছিলেন ক্ষণজন্মা পুরুষ খ্যাতনামা নাট্যকার, মহাকবি। ৺গিরিশ ঘোষের জীবনের শেষ ১৫ বৎসর অবিনাশ বাবু ছিলেন নিত্য সহচর। প্রচার বিমুখ, নিরলস কর্মী দাদামহাশয় ৺অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের কর্মময় জীবনের প্রতিফলন গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জীবনে অতি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

৺অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় এবং ঐ বংশের প্রতিষ্ঠাতা "জটাধর স্বামী" সম্বন্ধে কিছু না জানিলে, শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্বন্ধে

আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, সেই কারণে তাঁহার বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। বিস্তারিতভাবে জানিতে ইচ্ছা করিলে গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় "বর্দ্ধমানের ডাক" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে "বিখ্যাত দেবগ্রাম" নামক যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে জনিতে পারিবেন।

ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাবে বাংলাদেশ যে সময় জর্জ্জরিত, সেই সময় ঐ রোগের অব্যর্থ ঔষধ "দেবগ্রামের আরক" বর্দ্ধমান সদর থানা হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত ক্ষুদ্র পল্লী দেবগ্রামকে সকলের নিকটসুপরিচিত করিয়াছিল। পূর্বে ঐ স্থান ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। "জটাধর" নামক সাবর্ণ গোত্রজ গঙ্গোপাধ্যায় বংশের এক তেজস্বী ভগবৎপ্রেমিক ব্রাহ্মণ ঐ জঙ্গলে কুটির নির্মান করিয়া বসবাস করিতেন। এক রাত্রে স্বপ্নে তিনি দেখিতে পান, চারিদিক উজ্জ্বল স্নিগ্ধ আলোয় উদ্ভাসিত করিয়া "মহাদেব" তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি পরদিন ঐ সংবাদ বর্দ্ধমানাধিপতিকে জানাইলে তিনি বলেন, "আমিও গত রাত্রে ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি।" বর্দ্ধমানাধিপতি স্বয়ং ঐ জঙ্গলে পদার্পন করেন এবং জটাধর স্বামীর কুটিরের অনতিদূরে এক প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পান। অল্প আয়াসে এক বৃহদাকার শিবলিঙ্গের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়। ঐ শিবলিঙ্গ উক্তস্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজার নিমিত্ত পঁচিশ বিঘা নিষ্কর সম্পত্তি দান করিয়া "জটাধর স্বামীকে" বুড়া শিবের পূজারী নিযুক্ত করেন। কালক্রমে শিবের ঘর ও আটচালা জীর্ণ হওয়ায় দেবগ্রামের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার শ্রীঅনন্তকুমার দত্ত ও তাঁহার সাধ্বীপত্নী "বুড়া শিবের" প্রকাণ্ড মন্দির ও তৎসহ নাটমন্দির নির্মান করাইয়া দিয়া জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন। গঙ্গোপাধ্যায় বংশের বংশধরেরা আজও ঐ শিবের নিত্য সেবা করিয়া আসিতেছেন।

উক্ত গঙ্গোপাধ্যায় বংশের বর্দ্ধমান মহারাজা কর্ত্তৃক প্রদত্ত 'মিশ্র' নামে আর একটি উপাধী বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ঐ বংশের

খ্যাতনামা কবি কৃপারাম যে "সত্যনারায়ণের কথা" প্রকাশ করেন তাহা হইতে পাওয়া যায় ঃ—

"জটাধর ঠাকুরের পুত্র নবনী ঠাকুর।
তাহার মধ্যম পুত্র কানুরাম সুর ॥
তাহার তনয় সুত নাম কৃপারাম
এই পঞ্চ পুরুষ নিবাস দেবগ্রাম ॥

* * * *

পীরের মঙ্গল কথা হৈল সমাধান
নৃপতি তেজশ্চন্দ্রের বাড়ক কল্যাণ ॥
কৃপারাম দ্বিজ ভনে, শুনে সত্যপীরে।
নায়কের তরে সদা রাখিবে সুস্থিরে ॥"

গুরুদেব শ্রীরমকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দাদামহাশয় ৺অবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার পিতৃদেবের ইচ্ছানুসারে উক্ত সত্যনারায়ণের পাঁচালিখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। পরে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি "ক্রীয়াকাণ্ড বারিধি" নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছিছেলেন। [পৃঃ ২৯০-২৯৮]

৺অবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় দেবগ্রামের গঙ্গোপাধ্যায় (মিশ্র) বংশে সন ১২৭৮ সালে ৪ঠা আষাঢ় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺মহেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়। মহেন্দ্রলাল কলিকাতায় কেরানীর কার্য করিতেন। অবিনাশচন্দ্র গ্রামের পাঠশালায় মেধাবী ছাত্রহিসাবে সুনাম অর্জ্জন করিয়া গৌরবের সহিত পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করিলে, পুত্রকে নিজের কাছে ১৪নং রামকান্ত বসুষ্ট্রীটে রাখিয়া "নিউ ইণ্ডিয়ান" স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। উক্ত স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়িবার সময়ে তিনি যে সকল কবিতা রচনা করেন, তাহার সামান্য অংশ নিম্নে দিলাম।

"এস মা বঙ্গীয় তারা এ চণ্ডীমণ্ডপে
এস দেখি সিংহপৃষ্ঠে তেমতি প্রতাপে

দশভূজা দশদিশি কর রক্ষা শত্রুনাশি
থাকি একদিন মোরা ভুলি দুঃখ তাপে।"

*　　*　　*　　*

"তাই বলি ত্রিনয়নী স্বয়ম্ভুরূপিনী
শ্রীচরণে নমি মোরা, বঙ্গের জননী।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে বুঝুক যে যা বুঝে
নিত্যানিত্যময়ী তুমি অনন্ত রূপিনী।"

তিনি বহু কবিতার পুস্তক প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রকাশিত "স্মৃতি পথে" কবিতার সামান্য অংশ নিম্নে দিলাম, উহাতে তাঁহার জীবনের ছবির কিঞ্চিৎমাত্র প্রতিভাত হইয়াছে।

"প্রবাসে আসিয়া সদা নানা কাজে থাকি
অবসর পাই যে সময়,
জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাসগুলি
মনে আসি উপনীত হয়।
মনে পড়ে জননীর বুক ভরা স্নেহ
ভগিনীর সস্নেহ যতন,
মনে পড়ে সোদরের আধ আধ বাণী
মনে পড়ে প্রতিবেশীজন
মনে পড়ে বন্ধুদের অম্লান বদন
মনে পড়ে শিশুদের হাসি।"

প্রবেশিকা ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ইং ১৮৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনিই সর্বপ্রথম "Bengali Translation of Entrance Course, 1894 & 1895—Complete in one volume" প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের প্রশস্তি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বাহির হয়। Amrita Bazar Patrika, 6 th April, 1894, ঐ পুস্তক সম্বন্ধে লেখেন, '* * * The rendering is accurate, idiomatic and as literal as practicable. The book will no doubt, be a great helf to our students."

ইং ১৮৯৯-১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হস্তরেখাবিশারদ শ্রীরমনকৃষ্ণ চট্টো-পাধ্যায়ের নিকট কাজ করিতেন। তিনি ইংরাজী পুস্তক হইতে তরজমা করিয়া দিতেন এবং রমনকৃষ্ণ বাবু তাহা হইতে শিষ্যের প্রশ্ন ও গুরুর উত্তর এইভাবে গ্রন্থ রচনা করিতেন। কলিকাতায় প্লেগ মহামারী-রূপে দেখা দিলে তিনি দেবগ্রামে চলিয়া আসেন। পরে কলিকাতা যাইয়া জানিতে পারেন রমনবাবু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। কিছুদিন পরে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন এবং গিরিশ বাবু তাঁহাকে সহকারী হিসাবে থিয়েটারের কর্মচারীর অন্তর্ভুক্ত করেন। অবিনাশ বাবুর অমায়িক ব্যবহার, অধ্যবসায়, সৎচরিত্র, ধর্মভাব ও নিরাসক্তি প্রভৃতি গুণের পরিচয় পাইয়া গিরিশবাবু বিশেষ মুগ্ধ হন। অবিনাশবাবুর সহিত পরামর্শ না করিয়া, গিরিশবাবু কোন কাজ করিতেন না। গিরিশবাবু মুখে মুখে বলিতেন এবং অবিনাশবাবু তাহা লিখিয়া নাটকের রূপ দিতেন। গিরিশচন্দ্রের গ্রন্থরাজির মধ্যে অবিনাশবাবুর বহু লেখাই আত্মগোপন করিয়া আছে। থিয়েটার সংক্রান্ত বহু তথ্যের ও বহু রসাল গালগল্পের তিনি ছিলেন অফুরন্ত ভাণ্ডার। তাঁহার রচিত "রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা" একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

অবিনাশবাবু কর্তৃক ১৩২০ সালে চার খণ্ডে প্রকাশিত 'গিরিশচন্দ্র' (বৃহৎ জীবনী) একখানি আকর পুস্তক। ইহা ছাড়াও তিনি বহুগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তৎকালীন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়, তাঁহার নাটক কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশিত হয়।

"নারীপ্রগতি" নাটকের লেখক শ্রীহেমেন্দ্র লাল পালচৌধুরী তাঁহার পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—মহাকবি গিরিশচন্দ্রের নিত্য-সহচর, সাহিত্যিক ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক "নারীপ্রগতি" সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত।"

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য এম, এস-সি, তাঁহার প্রকাশিত "গিরিশচন্দ্র" নামক পুস্তকের "Preface" এ লিখিয়াছেন—" * * * The very brief life history of the poet contoained in

the thesis is based chiefly on the poets biography by SJ Aubinash Chandra Ganguli."

"বর্দ্ধমানের ডাক" পত্রিকায় "দেবগ্রামের কথা" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবার পর উক্ত পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরাধাগোবিন্দ দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে লেখেন,—"* * * কয়েকদিন আগে বর্দ্ধমান রাজ কলেজের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীকালীপদ সিংহ, অবিনাশ বাবু সম্পর্কে তোমার সংগ্রহের প্রশংসা করছিলেন। রাজ কলেজ লাইব্রেরীতে অবিনাশবাবুর লেখা গিরিশ জীবনী গ্রন্থ আছে এবং তিনি তা পড়েছেন। তাঁর মতে বইখানি একটি আকর গ্রন্থ। বইখানির একখানি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ লেখা ও প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বিশেষ করে বললেন। তোমাকেই অবিনাশ বাবুর জীবনী লেখার ভার নেওয়ার জন্য বললেন।"

* * *

অবিনাশবাবু ও গিরিশবাবু উভয়েই পরমপুরুষ রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। সন্তানকে দুধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে সঙ্গিনীর সহিত গল্প করিতে করিতে, এক হাতে তপ্ত বালির উপর ধান নাড়িতে নাড়িতে, অপর হাত ঢেঁকির গড়ের ধান উল্টাইয়া দিতে দিতে কিভাবে ভগবানের প্রতি দৃষ্টি রাখা যায় অবিনাশবাবু তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব সেই দৃষ্টান্ত উজ্জ্বলতর করিয়া আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেছেন।

অবিনাশ বাবুই গুরুদেবের নাম রাখেন, "রামকৃষ্ণ।"

শৈশবে বালক সুলভ দুরন্ত, নির্ভীক, সত্যভাষী রামকৃষ্ণ দেবগ্রামের পথে ঘাটে মাঠে অবাধে ঘোরাফেরা করিয়া প্রকৃতি দেবীর ক্রোড়ে বড় হইতে লাগিলেন। গ্রামের সকল লোকই তাঁহার আপন পর বলিয়া কোনপার্থক্য তাঁহার নিকট নাই। মধ্যে মধ্যে পিতৃগৃহ বড়বেলুনে মায়ের সহিত অসিতেন, কিন্তু তাঁহার শৈশবের বেশীর ভাগ সময়ই কাটে মাতুলালয় দেবগ্রামে। দেবগ্রামে স্বর্ণচালিদা নিবাসী শ্রীনিরঞ্জন ঘশ মহাশয়ের পাঠশালায় তাঁহার পাঠ আরম্ভ হয়। সেখান হইতে

আসিয়া বড়বেলুন বকুলতলা বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়া বড়বেলুন মধ্য ইংরাজী স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। পরে কুরমুন নিত্যচরণ ইনষ্টিটিউশনে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করেন। ইতিমধ্যে সন ১৩৩৯ সাল ৪ঠা ফাল্গুন' উপনয়ন হয়। উপনয়ণের পর হইতেই যথারীতি সন্ধ্যা আরাধনা করার সঙ্গে সঙ্গে, ইষ্টদেবীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হন। বালক রামকৃষ্ণের অতি প্রিয় কাজ ছিল ৺মায়ের প্রতিমা নিজ হাতে গড়িয়া পূজা, আরতি সমাপ্ত করিয়া আনন্দে মাথায় করিয়া নাচিতে নাচিতে পুকুরের জলে মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দেওয়া। মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দেওয়ার পরই আরম্ভ হইত নূতন মূর্ত্তি গড়ার কাজ। উপনয়নের পর সময় পাইলেই বুড়ামার মন্দির চত্বরে বসিয়া আত্মভোলা হইয়া ধ্যান করিতেন। সে সময় তাঁহার বাহ্যিক জ্ঞান থাকিত না। সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই ছুটিয়া যাইতেন।

এই সময় এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। ১৩ বৎসর বয়সে তিনি এক অমাবস্যার মহানিশায় বড়বেলুন শক্তিপীঠে ভৃগুরাম স্বামীর প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডীর আসনে ভাবাবিষ্ট চিত্তে নির্জনে একাকী বসিয়া আছেন, রাত্রি দ্বিপ্রহরে মহামায়ার প্রভাবে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া যান। কতক্ষণ ঐরূপ অবস্থায় ছিলেন, তাহার ঠিক নাই। ঐ সময় পূর্বজন্মার্জিত সুকৃতির ফলে মহামায়ার কৃপায় তিনি ইষ্টমন্ত্র লাভ করেন।

ইহার পর সুবিধা সুযোগ পাইলেই, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, স্বামী, সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেন— "আমার ইষ্টদেবী কে? আমার ইষ্টমন্ত্র কি?" কাহারও নিকট কোন সদুত্তর পান নাই।

পরে তিনি নাসিগ্রাম হাইস্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। সে সময় তাঁহার পিতা কলিকাতায় "ভারত লেবরেটারী ও কেমিক্যাল ওয়ারকস" এ কাজ করিতেন। নাসিগ্রাম হাইস্কুলে পাঠ্যাবস্থায় দাদা-

মহাশয় ৺অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে যে পত্র দেন, তাহারি উত্তরে অবিনাশবাবুর উত্তর নিম্নরূপ :—

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং

"গিরিশ ভবন"
১৩নং বসুপাড়া লেন
বাগবাজার, কলিকাতা
(১১ই শ্রাবণ, ১৩৪৪ সাল, ২৭।৭।৩৯)

পরমকল্যাণবরেষু—

ভাই রামকৃষ্ণ, তোমার চিঠি অনেকদিন পেয়েছি; উত্তর অনেক আগেই লেখা উচিত ছিল। কিন্তু ঘটে উঠেনি; তার প্রধান কারণ প্রায় মাসাবধি আমাশায় ভুগছি।

* * *

তুমি চিঠিতে লিখেছ, "স্কুল বেশ চলিতেছে—পড়াশুনা খুব ভালই হইতেছে।" এ সংবাদে বড়ই সুখী হইলাম—আশীর্বাদ করি দীর্ঘজীবী হও এবং আগামী বৎসরে সগৌরবে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হও। সদা সর্বদা স্মরণ রাখিবে, বাপের জমিদারী নেই বা বিষয় সম্পত্তি এমন নেই, যাতে কাজকর্ম না করে চলে যাবে। আমাদের চাকরী করে খেতে হবে। পাশ করে লোক চাকরী পায় না, আব যদি একটাও পাশ করতে না পারো তাহলে ষাঁড়ের গোবর হয়ে থাকতে হবে। ম্যাট্রিক পাশটা করলেও যে কোন অফিসে ঢুকিয়ে দিতে পারবো। আর যদি ভাল করে পাশ করে শিক্ষালাভ করো, তা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে ?

* * *

বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া যে বিষয়ে কাঁচা আছ, সে বিষয় শিক্ষক মহাশয়ের উপদেশ নিয়া পাঠ্য বিষয় মনঃ সংযোগ করিবে। অধিক আর কি লিখিব। স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখবে। মাঝে মাঝে চিঠি লিখে সুখী করবে। ইতি

নিত্য অশীর্বাদক
শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

নাসিগ্রামে থাকাকালীন প্লীহারোগে আক্রান্ত হইয়া বিশেষ কাহিল হইয়া পড়িলে পিতৃদেবের নিকট কলিকাতায় যাইয়া চারুচন্দ্র ইনষ্টিটিউসনে ক্লাস টেনে ভর্ত্তি হন। কলিকাতায় আসিয়াই বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হইয়া পড়েন। ইং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বোসের নেতৃত্বে ভবানীপুর, টালিগঞ্জ, কালিঘাট প্রভৃতি স্থানে পিকেটিং করেন। এই সকল কাজের মধ্যেও ত্রিসন্ধ্যা করিতে কখনও ভুলিতেন না। ইং ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কর্ত্তৃক কলিকাতায় বোমা ফেলা হইলে তিনি দেবগ্রামে চলিয়া আসেন। তাঁহার পিতাও চাকুরী ত্যাগ করিয়া বড়বেলুনে ফিরিয়া যান। এই সময় বর্ত্তমানে বর্দ্ধমান নিবাসী "বর্দ্ধমানের ডাক" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরাধাগোবিন্দ দত্ত মহাশয় কুরমুনে বসবাস করিতেন .এবং তাঁহার অধীনে কংগ্রেসের এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়। বালক রামকৃষ্ণ ঐ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান করিয়া স্বরচিত কবিতার, গান করিয়া গ্রামেগঞ্জে ঘুরিয়া চাউল, কাপড়, অর্থ ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া কংগ্রেসের অর্থ ভাণ্ডার পূর্ণ করেন। তাঁহার গাওয়া গানের মধ্যে একটির কিছু অংশ নিম্নে দিলাম।

"কোথা মহারানা, কোথা পৃথ্বীরাজ
নেই তারা আজ কে করিবে কাজ
তোমরাও যদি ঘুমাইবে ভাই।"

* * *

এই সময় বড়বেলুনের পৈতৃক বাসগৃহ সংস্কারের অভাবে বাসের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। মাতৃদেবীর ইচ্ছানুসারে সামান্য টাকা সম্বল করিয়া একখানি নূতন গৃহ নির্মানের কাজে হাত দেন এবং সন ১৩৪৩ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ উহার নির্ম্মান কার্য শেষ হয়।

দেবগ্রামের পল্লীনিকেতনে তাঁহার অতি প্রিয় দাদু ৬৭ বৎসর ১০ মাস বয়সে সন ১৩৪৬ সাল ৩রা বৈশাখ সোমবার রাত্রি ২টা ৫মিঃ দেহত্যাগ করেন। ইহার কিছুদিন পূর্বে নাতি রামকৃষ্ণ কলিকাতা হইতে দাদুকে দেখিতে আসেন। সে সময় তিনি কিছুটা সুস্থ ছিলেন।

দামোদর ক্যানেলের বাঁধের ধারে দাঁড়াইয়া সূর্যদেব অস্তাচলে যাইবার দৃশ্য দেখিয়া পাশে দণ্ডায়মান নাতিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, "ডুবু ডুবু হবে চাকি, লড়াই কি আর থাকবে বাকি? —রামকৃষ্ণ দিন ঘনিয়ে এসেছে, সব ফেলে চলে যেতে হবে।" নাতির উত্তর, "তাই কি হয়? এখন কি যাবার সময় হয়েছে নাকি?"

"ওরে শালা, কাজ শেষ হলে চলে যেতে হয়, এটাই নিয়ম।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণানি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥"

বিদায়ক্ষণে দাদুকে বলিলেন, "দাদু আপনাকে ছেড়ে আমার যেতে ইচ্ছা করছে না—সবাই পড়ার ক্ষতি হবে বলে আমায় যেতে বলছে—আমি কলিকাতায় যাব কি?"

দাদু উত্তর করিলেন, "যাও রামকৃষ্ণ, আমি আশীর্বাদ করি, চিরজীবী হও, চিরসুখী হও, চিরজয়ী হও।"

এই তাঁর দাদুর সহিত শেষ দেখা। দাদুর মৃত্যু সংবাদ, বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার পাতায় ছাপার অক্ষরে দেখিতে পান।

দাদুর তিরোধানেব ব্যথা সামলাইতে না সামলাইতে তাঁহার ম্যাট্রিক পরীক্ষার শেষ দিন ১৯৪৬ সালের ৯ই ফাল্গুন, তাঁহার গর্ভধারিণী তাঁহাদের প্রতি সকল মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া যথোচিত ধামে গমন করেন। বালক রামকৃষ্ণেরও সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন হইল। তাঁহার পরীক্ষা দেওয়াও ঠিকমত হইল না। তিনি গৃহত্যাগ করিয়া সারা ভারতবর্ষের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বের বিভিন্ন তীর্থে তীর্থে দেব-দেবী দর্শন করিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। তাঁহার এক মাত্র প্রশ্ন—

ইষ্ট দেবী কে? ইষ্ট মন্ত্র কি?

এ প্রশ্নের উত্তর এখনও পাইলেন না।

কর্মক্ষেত্র

"তবু ভরিল না চিত্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া
তাই মা তোমার কোলে এসেছি আবার।"

কর্মবীর দাদুর উপযুক্ত নাতি ইং ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে দেবগ্রামে ফিরিয়া কর্মযজ্ঞে ঝাঁপ দিলেন। তাঁর মূলমন্ত্র হইল 'কর্মই ধর্ম।" তিনি আজও সকলকে সেই উপদেশ দেন। দেবগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, তাহার প্রধান শিক্ষকরূপে একদিকে যেমন বিদ্যালয়ের উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হইলেন অপরদিকে গ্রামের রাস্তা ঘাট নির্মাণ, ছেলেদের খেলার মাঠের ব্যবস্থা প্রভৃতি জন-হিতকর কাজে হাত দিলেন।

ইতিপূর্বে কলিকাতায় থাকাকালীন পিতৃদেব ও দাদুর নিকট জলখাবারের যে সামান্য অর্থ পাইতেন তাহা সঞ্চয় করিয়া টালিগঞ্জ অঞ্চলে ৩০০'০০ টাকায় দুই কাঠা বাস্তু জমি পিতার নামে ক্রয় করিয়া রাখেন।

দেবগ্রামে আসার এক বৎসরের মধ্যেই, দাদুর স্মৃতিতে "অবিনাশ সাহিত্য মন্দির" নামক সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করেন। বহু কবি ও সাহিত্যিকের সহিত যোগাযোগ করিয়া বিনামূল্যে বহু বই সংগ্রহ করেন। বহু প্রতিষ্ঠান, এমন কি বিদেশী পত্র-পত্রিকা প্রকাশক সংস্থার সহিত যোগাযোগ করিয়া বহু পুস্তক এবং নিয়মিত দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকা সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া দাদুর সংগৃহীত প্রায় দুই হাজার মূল্যবান পুস্তক এই পাঠাগারে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। প্রতি বৎসর এখানে ৺অবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিপূজা করা হইত। তিনি পাঠাগারের সকল পুস্তক অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। কোন পুস্তকের কত পৃষ্ঠায় কি আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা বহুদিন মনে রাখিতে

পারিতেন। সাধারণ ছাত্রদের ন্যায় স্কুল, কলেজে পাশ করা ডিগ্রী না থাকিলেও, তাঁহার জ্ঞান ভাণ্ডার বিশেষ সমৃদ্ধ। তিনি দেবগ্রাম হইতে বড়বেলুনে চলিয়া আসিবার সময় ঐ পাঠাগারে প্রায় চার হাজার পুস্তক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া আসেন। কালক্রমে ঐ পাঠাগার নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

দেবগ্রামে গুরুদেবের নিত্যসাথী ছিলেন—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীললিত মোহন দত্ত, শ্রীকিশোরীমোহন দত্ত, শ্রীঘনশ্যাম হাজরা ও ৺পঞ্চানন রক্ষিত। গুরুদেবের জীবনে এই অকৃত্রিম সুহৃদবৃন্দ বহু পরিকল্পনার রূপদানে সাহায্য করিয়াছেন। দেবগ্রামে জনহিতকর কার্য ছাড়াও হরিনাম সংকীর্ত্তন দল এবং গ্রামে যাত্রা পার্টি তৈয়ারী করেন এবং স্বয়ং বহু নাটকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাঁহার এই সমস্ত কার্য্যে উৎসাহদাতা ছিলেন, তাঁহার ছোট দাদু স্বর্গীয় হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় ননীগোপাল দত্ত। হরিমোহন বাবু তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, কোন ভাল খাবার জিনিষ পাইলে তাঁহাকে না দিয়া খাইতেন না। খাইবার সময় স্নেহের নাতিকে ডাক দিতেন—"রামকৃষ্ণ! রামকৃষ্ণ!" সাড়া না পাইলে জোরে ডাক দিতেন—"রামময়"! তাহাতেও সাড়া না পাইলে ডাক দিতেন—"রেমো-রে!" সে ডাক প্রতিবেশীরাও শুনিতে পাইতেন। এখনও দেবগ্রামের বহু লোক এই ঘটনা লইয়া নানা প্রকার গল্প করেন।

দেবগ্রামের জমিদারীর খাস লইয়া মামলার উৎপত্তি হইলে গুরুদেব একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। তাহার কিছু অংশ উদ্ধৃত করিলাম—

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামবাসী।
সদা থাকিত তারা খুব মেলামেশী॥
গৃহে গৃহে কভু সেথা ছিল না বিবাদ।
'বাঁড়ুজ্যে' কোম্পানী এসে বাধাল ফেসাদ॥

ছিল এই পল্লীবাসী খুব সঙ্ঘবদ্ধ।
কয়েকটি মো-সাহেবে ক'রল সবে অন্ধ॥
গ্রামের হিতের তরে ছিল বারোয়ারী।
প্রত্যেকে হ'ল যেন এক এক মাড়োয়ারী॥
পেটে তাদের নেই কিছু, বচনেই সার।
একটু কিছু হ'লে পর, ধর্ শালাকে মার॥

* * * *

গুরুদেব পল্লীমঙ্গলের জন্য বা রূপ-রস-রঙ্গ লইয়া কবিতা, প্রবন্ধ রচনা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি মাতৃদেবী ও দাদা মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে যে সকল কবিতা রচনা করেন, তাহার কিছু নমুনা নিম্নে দিলাম।

মাতৃদেবীর পরলোকগমনে স্মৃতি

(১)

সে যে সন ১৩৪৬ সনে ফাল্গুন মাসের ন' তারিখে গো.
আজি কেন, অশ্রু ধারা ঝরে,
হিয়া মাঝে স্মৃতি কার গুমরিয়া কাঁদে গো,
বাধা না মানিয়ে?
চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা
ছিল যারা, আছে তারা
ধরা মাঝে বুক ভরা জীব ধারা বহে গো।
তবু প্রাণে শূন্য ঠাঁই
আসনে মূরতি নাই
মা মোদের ভুলায়ে ফেলে চলে গেছে গো।

(২)

কোলাহল পশি কানে কুহক ঘটায় গো
বাড়ে নির্যাতন
মনে হয় অন্তঃপুরে
মা আছেন কর্মঘোরে
স্বপ্ন ভাঙ্গে তবু হায়। কেন না জানি গো
অন্তঃপুরে ছুটে যাই
মা নাই, মা নাই
শূন্য আঁখি শূণ্য ঠাঁই, অভিমানে কাঁদে গো।

(৩)

জননী গো স্নেহময়ী কি বলিয়া ডাকি মাগো
কেমনে সুধাই
কি নাম সেগুণরাশি উজলি ফুটাই গো
জগতে জানাই
মা মা ডাকি হায়
এস আজি একবার
ডাকিলে মায়ের প্রাণ কাঁদিবে নিশ্চয় গো
এস মা ত্রিদেব পথে
অমর কনক রথে
অবোধ সন্তানের শিরে পদধূলি দাও গো

(৪)

সে মধুর "রামকৃষ্ণ" বুলি আবার শুনিব গো
উথলি পরাণ
স্নেহের পরশ জাগি দুখ ঘুমে ভোর গো
শিহরিবে গান।
পদতলে লুটে পড়ি
দিব কত গড়াগড়ি

মা, মা বলে আঁখি বারি চরণে ঢালিব গো
জননী লবেন তুলি,
সব তাপ যাব ভুলি,
আমর আশীষ বাণী, শ্রবণে পশিবে গো।
[শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ২রা শ্রাবণ, ১৩৪৮]

অবিনশ্বর অবিনাশ

(১)

ছিলে অবিনাশ অক্ষয় তুমি, ছিল না যে কভু তোমার ক্ষয়।
সাহিত্য সেবায় ছিলে যে রত, করেছিলে তুমি জগৎ জয়॥
হিমাদ্রির মত ছিলে যে অটল, মুক্ত যে ছিল তোমার প্রাণ।
নির্মল তোমার সকল প্রতিভা রয়েছে সদা বিদ্যমান॥

(২)

"জগদ্ধাত্রী" তব অন্তর্যামী, ছিলে তুমি তাঁর পরম ভক্ত।
তাঁরই আশীষে হয়েছ যে জয়ী, সে সাধনা ছিল অতি শক্ত॥
ছিলে চিরসঙ্গী তুমি বঙ্গের গ্যারিক কবি গিরিশচন্দ্রের।
অতল সাগর সম ছিল ভালবাসা উভয়ের॥

(৩)

"গিরিশচন্দ্র" করিবে অমর তোমায়, নেই তাতে কোন ভুল।
রচিয়াছ তুমি নিখুঁত ভাবে সকলেই তার পায় যে কূল॥
ইংরাজী সাহিত্যের "কী নোট" তুমিই প্রথম রচিলে জানি।
প্রবেশিকা ছাত্রদের মহাউপকার হয়েছিল তাহা মানি॥

(৪)

ছিলে সম্পাদক তুমি "অদৃষ্ট" ও "উন্নতি" মাসিক পত্রিকায়।
প্যালমিষ্টারী, ফ্রেনোলজি ফাইসিগোনমি, অনুবাদ তখন করিতে বাংলায়॥

করিতে তুমি জ্যোতিষ চর্চ্চা, ছিলে তাতে অতি নিবিষ্ট।
দেখিতে হস্ত কত নর-নারীর, বলিতে তাদের অদৃষ্ট॥

(৫)

বহু লেখা তোমার আছে নাটকে, কিছু নেই তার অন্ত।
কত লেখককে করেছিলে দান, সে সব রয়েছে গুপ্ত॥
ছিলে তুমি শেষ অকৃত্রিম বন্ধু, বঙ্গীয় নাট্যশালার।
রহিবে অপূর্ণ বহু কাল, এ স্থান, বিয়োগে তোমার॥

(৬)

ছিলে তুমি সাধু চরিত্র, লোভশূন্য, নিরবকর্মী ও নিরভিমানী।
ছিলে "স্বাতিনায়" মজলিসি লোক, সুরসিক ও মিষ্টভাষী॥
তব কাছে গেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিতেন কাটায়ে সরস
কথাবার্ত্তায়।
বসিলে সহজে ওঠা দায় হতো, যদিও ছিলে শায়িত রোগশয্যায়॥
তুমি যে ছিলে উদার হৃদয়, "না" বলিব কোন মুখে।
তুমি যে ছিলে সবার প্রিয়, কেঁদেছ তাদের দুখে॥

(৭)

আমি এনেছি বহু দূর হতে, ধূপ দীপ সহ তোমারই পূজার ডালা।
বাংলা মায়ের সাজিটী প'রে চন্দন চর্চ্চিত ফুলের সুরভি ঢালা॥
এস সাহিত্যিক জাগ মোর হৃদে, লও পুষ্পাঞ্জলি মোর।
তোমার মহিমা যশ কীর্ত্তনে বহিছে বন্যা নয়নেরি লোর॥

[শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য,
অবিনাশ ৩য় বার্ষিকী স্মৃতিসভায় পঠিত হয়।
১৪ই বৈশাখ, ১৩৪৮, দেবগ্রাম, বর্দ্ধমান।]

দেবগ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করিতে করিতে ইং ১৯৪২ সালে "ভারত ছাড়" আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করিয়া এক বৎসরের অধিক কাল স্থানান্তরে অতিবাহিত

করিয়া পুনরায় দেবগ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে ফিরিয়া আসেন। দেবগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া গুরুদেব পুনরায় দেবগ্রামের শ্রীবৃদ্ধির জন্য নিজেকে নিযুক্ত করেন। এই সময় দেবগ্রামের আশ্রম নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ঐ আশ্রমের জমি ও পুকুর মালিক পক্ষ গ্রহণ করেন। সুবিখ্যাত গায়ক ৺কৃষ্ণদাস বৈরাগ্য এবং নিত্যদাস বৈরাগ্য সামান্য জায়গায় গৃহ নির্মাণ করিয়া বসবাস করিতেন। ঐ সময় গুরুদেবের প্রচেষ্টায় এক সভার আয়োজন করা হয়। তাঁহার স্থাপিত দেবগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের লইয়া এক নগর কীর্তন বাহির করেন। এই নগর কীর্তনে প্রায় পঞ্চাশ টাকা সাহায্য সংগৃহীত হয়।

শ্রীমৎ অধর চাঁদের স্মৃতিসভায় তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা আলোচিত হয়। যাহাতে আশ্রমটি নব কলেবর ধারণ করে, তাহার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। এই উপলক্ষে বালক, বালিকা ও হরিজনদের ভোজন করান হয়।

শ্রীনিত্যদাস বৈরাগ্য বর্তমানে ৺অধর চাঁদের জন্মতিথিতে তিন দিন যাবৎ উৎসব পালন করিতেছেন। আশ্রমের মন্দির ও আটচালা নির্মাণের জন্য জনসাধারণ ও স্থানীয় ডাক্তার শ্রীঅনন্তকুমার দত্তের অবদান উল্লেখযোগ্য।

আশ্রম নবকলেবর রূপ গ্রহণের দিন বিখ্যাত গায়ক ৺কৃষ্ণদাস বৈরাগ্য যে গানটি স্বয়ং রচনা করিয়া নিজেই গাহিয়াছিলেন তাহা নিম্নরূপ :—

ওগো দয়াময়, কেন নিদয়, হ'য়ে সদয় দাও দরশন।
দেবগ্রাম নাম শান্তিময় আশ্রম, কেন অশান্তির অনল উঠে
ক্ষণে ক্ষণ ॥ ১

কোন দেশে প্রভু আছো গো এখন, কাছে কে বা আছে
সেবার কারণ, সেবায় অধিকার করগো আমায়
অধীন দাসের এই নিবেদন ॥ ২

তিরোভাবের কথা করিয়া শ্রবণ, আকুলিত প্রাণে
কাঁদে ভক্তগণ, সেই ক্রন্দনের ধ্বনি, (দেখা) পৌঁছায় না জানি
যে দেশেতে প্রভু আছো গো এখন ॥ ৩
কতই ডাকিতেছি গুরুদেব বলে, অনুগত জনে আছ
কি গো ভুলে, আজি যে উৎসব, মিলি ভক্ত সব,
তোমার এরূপ করা সাজে কি এখন ॥ ৪
ভক্তগণ দুখ করিতে মোচন, একবার এস দয়াল
দাওগো দরশন, নয়নের জল, রেখেছে সবে
ধোয়াইতে তব যুগল চরণ ॥ ৫
আর কি লবে না ভক্তের পুষ্পাঞ্জলি, ডাকিবে না
মোরে "কৃষ্ণদাস" বলি, গান শুনে যার কৃপার ভাণ্ডার
দিয়েছিলে করে উন্মোচন ॥ ৬
এস প্রভু এস, বস গো আসনে, নাও আলাপ
কবতন্বুর মিলনে জুড়াক নয়ন মন, তাপিত জীবন,
শুনে তত্ত্বজ্ঞান গীতি আলাপন ॥ ৭
প্রেম সিন্ধু-বারি করে সঞ্চার, ভক্তমেঘগণে করাও বরিষণ,
সেই বারিগুণে প্রেমরত্ন ধনে, লাভ করুক দুই জগতজন ॥ ৮
কামিনী কাঞ্চন, সহযোগ সাধন্য, পুষ্পবন্তেই নিত্যানন্দ
মনে মিলন, ইহার সূক্ষ্ম মর্ম, কলিযুগ ধর্ম,
প্রচারিতে ধরায় আগমন ॥ ৯
তাই শুধাই প্রভু, আছ ত গো ভাল, ভক্তের নয়ন তারা,
আঁধারের আলো, আলোর পর আঁধার পথ চেনা ভার,
ডালায় ডালায় আলোতে করি গমন ॥ ১০
যেথায় থাক প্রভু, রেখ গো চরণে, তোমা হেন প্রভু
(যেন) পাই জন্মজন্মান্তরে, অবিদ্যার বশে, যদি যাই
অন্য দেশে ধরে কেশে করো আকর্ষণ ॥ ১১
আজি কেন দেখি, তব মূর্ত্তি চিত্রপটে আঁকা, কোথায় আছ প্রভু,
মোহ মেঘে ঢাকা, হও গো প্রকট, মোহ করি নাশ, দান বদনচন্দন
সুকিরণ ॥ ১২

আগন্তুক যত ভদ্র মহোদয়গণ, আর ছোট বড় যত ভক্তজন,
করুন আশীর্ব্বাদ, যেন না হয় বাদ শ্রীঅধর চাঁদ যুগল চরণ ॥ ১৩
তেরোশ উনপঞ্চাশ সালে পাঁচই চৈত্র, দেবগ্রামে এই সভার
উদ্বোধন, সভার পরিচালক শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, নিত্যদাস আদি
সুসজ্জন ॥ ১৪
শ্রদ্ধাভক্তি হীন ভজন পূজন, বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান বিবেক
হীনজনে ভবকূপ হতে তুলে, নিয়েছিল যারে,
করুন সেই কৃষ্ণদাসের প্রণতি গ্রহণ ॥ ১৫
—স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস বৈরাগ্য

দেবগ্রামে থাকাকালীন গুরুদেবের মাসীমাতা শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবীর বিবাহ উপলক্ষে বর্দ্ধমানের বড়বাজারে স্বর্ণকারের দোকানে গহনা গড়াইতে দেওয়া হয়। বিবাহের পূর্বদিন ঐ অলঙ্কার আনিবার ভার তাঁহার উপর পড়ে। স্বর্ণকারের দোকান হইতে অলঙ্কার পাইতে অধিক রাত্রি হইয়া যায়। দোকান হইতে বাহির হইয়া রিক্সায় আসিবার সময় তিনি লক্ষ্য করেন কয়েকজন লোক তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছে। পথে বিপদের আশঙ্কা করিয়া বাজে প্রতাপপুরে শ্রীক্ষেত্রনাথ গাঙ্গুলির বাড়ীতে আশ্রয় লন। কিন্তু কর্ত্তব্যানুরোধে সেখানে রাত্রি বাস করা সমীচীন মনে করিলেন না। রাত্রি ১১টার সময় ৺মা মায়ের নাম করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে মাতৃ চিন্তায় বিভোর হইয়া একাকী নির্ভীক চিত্তে হাঁটাপথে চন্দ্রহাটী গ্রামের পাশ দিয়া ক্যানেলের পুল পার হইয়া আসিতেছিলেন, সেই সময় ৬নং মেন ক্যানেলের ধার দিয়া আসিবার সময় দূর হইতে দেখিতে পান একটি বাছুর যেন বার বার ক্যানেলের জল পার হইয়া একবার এপারে, আসিতেছে, তার পরই আবার ওপারে যাইতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার ভাবান্তর ঘটে, তিনি অনুভব করেন, মহামায়া তাঁহাকে দেখাইতেছেন ভবনদী পার হওয়া কত সহজ। অভিভূতের ন্যায় কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর, আর এক দৃশ্য তাঁহার চোখে পড়িল। তিনি

দেখিতে পান মাঠের মধ্যে কে যেন একবার মাথা নোয়াইতেছে আবার মুখ তুলিতেছে। এবার তাঁহার মনে হয়—এটা কি কোন ভৌতিক ব্যাপার। যাহাহউক, ভূত হউক বা অন্য যা কিছু হউক দেখিতে হইবে কি ব্যাপার। ভয় শূন্য চিত্তে মাঠের মধ্যে অগ্রসর হইয়া দেখেন, একটি গাছের ডালে এক খণ্ড কাপড় আটকাইয়া আছে; বাতাসে গাছের ডাল নড়িতেছে এবং তাহার ফলে ঐরূপ মনে হইতেছে। তিনি নিজের সন্দেহ দূর করিয়া শেষ রাত্রে বাড়ী পৌছাইলেন, সকলে দুশ্চিন্তার হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। ইহার পর আর এক ঘটনা ঘটে যাহা সাধারণের মহা উপকারে লাগিয়াছে।

সন ১৩৫০ সালে বর্দ্ধমান সদর থানার অন্তর্গত দেবগ্রাম গ্রামে অক্ষয় তৃতীয়ার রাত্রে কুলদেবীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে থাকিতে বিভূতি দর্শন করিয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন। ঐ অবস্থায় তিনি তিন দিন তিন রাত্রি ছিলেন। সকলে ধারণা করিল তিনি শারীরিক কোন কারণে অজ্ঞান হইযা পড়িয়াছেন। তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু ঐ অবস্থায় তিনি "শক্তিপীঠের" আদ্যপ্রান্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। যে সকল ঘটনা ঐ সময় তিনি প্রত্যক্ষ করেন তাহা অবলম্বন করিযা সন ১৩৫৩ সাল ২৫শে ফাল্গুন রাত্রি ১২টার সময় "বড়কালীর আদ্যকথা" রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ভোর রাত্রে উহা লেখা শেষ হয়। পরে ঐ লেখা সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিয়া ১৩৫৪ সালের বৈশাখ মাসে পিতৃদেবকে পাঠ করিয়া শোনান। পিতৃদেব উহা শ্রবণ করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন এবং আন্তরিকভাবে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পরপারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন।

নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পিতৃদেবের আদেশে সন ১৩৫৩ সালের ৮ই শ্রাবণ বিবাহ করিতে হয়। বিবাহ করিতে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। ইতিপূর্ব্বে যে সকল লোক তাঁহার পিতার সহিত তাঁহার বিবাহের কথাবার্ত্তা বলিতে আসিতেন, তিনি তাঁহাদের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া জানাইয়া দিতেন যে, তাঁহার পিতার আর্থিক অবস্থা

তাল নয়, তিনি নিজে লেখাপড়াও বিশেষ জানেন না, সামান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, এরূপক্ষেত্রে তাঁহার সহিত কাহারও কন্যার বিবাহ দেওয়া ঠিক নয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে ঐরূপ ঘটনা ঘটিবার পর তাঁহার পিতা জানিতে পারিয়া তাঁহার সহিত নানা প্রকার যুক্তি তর্ক করেন, তাহাতে ফল না হওয়ায় তিনি আদেশ করেন এবং সে আদেশ তিনি লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না।

বর্দ্ধমান জেলার সামন্তি গ্রাম নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ গোস্বামী বংশের শ্রীইন্দ্রনারায়ণ গোস্বামীর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী অনিমা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। উক্ত গোস্বামী মহাশয়ের দুই পুত্র বর্ত্তমান। কন্যার বিবাহের জন্য বিভিন্ন স্থানে পাত্রের সন্ধান করিতে করিতে বাকলসা নিবাসী তাঁহার বন্ধু ডাক্তার কমলাপতি চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে জানান, "তিনটি পাত্রের সন্ধান আছে। সংবাদ পাওয়া মাত্র এখানে আসিবে।" সংবাদ পাইবার পরদিনই তিনি বাকলসায় তাঁহার বন্ধুর বাড়ীতে উপস্থিত হন। সমস্ত শুনিয়া অপর দুইটি পাত্রের কথা বিবেচনা না করিয়া বন্ধুর সহিত দেবগ্রামে গুরুদেবের মাতুলালয়ে যান। সেখানে তাঁহার মাতুল শ্রীমৃত্যুঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া একটি নির্দিষ্ট দিন স্থির করেন? উক্ত নির্দিষ্ট দিনে প্রাতঃকালে উভয়ে দেবগ্রামে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হন। ঐ দিন সেখানে গুরুদেবের পিতা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করার পর বৈকালের দিকে, তিনজন বন্ধু শ্রীঘনশ্যাম হাজরা (শ্বেতপুর), শ্রীললিতমোহন দত্ত (দেবগ্রাম) ও শ্রীঅনিলকৃষ্ণ দত্তকে (দেবগ্রাম) সঙ্গে করিয়া গুরুদেব সেখানে উপস্থিত হন। পাত্র দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় স্থির করেন, এই পাত্রের সহিতই কন্যার বিবাহ দিবেন। সেই অনুসারে বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির করিয়া ফেলিলেন। সকল বিষয় স্থির হইবার পর রাত্রে গুরু-দেবের মামা গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন, "আপনি এখানে বসিয়াই বিবাহ স্থির করিলেন, পার্ব্বতীর ঘরবাড়ী জমি-জায়গা নাই, কন্যার বিবাহ দিবেন, সেগুলি দেখিলেন না?" উত্তরে গোস্বামী মহাশয়

বলেন, "তিনি এতদিন বড়বেলুনে বাস করিতেছেন। আস্তানা তাঁহার একটা আছে, সেই আস্তানাই আমার কন্যার পক্ষে যথেষ্ট।"

যাঁহারা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সংসার করেন তাঁহাদের কাজ-কর্ম সাধারণের চোখে একটু অদ্ভুতই ঠেকে। এখানে উক্ত গোস্বামী বংশের পরিচয় প্রদান করা প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

উক্ত গোস্বামী বংশের সিদ্ধপুরুষ শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী সামন্তি গ্রামের আদি দেবতা "বুড়া শিবের" উপাসক ছিলেন। কথিত আছে, তিনি রাত্রিকালে উক্ত শিবের সহিত সাক্ষাৎভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেন। ঐ শিব মন্দিরের নিকট একটি ব্রাহ্মণ বাড়ী ছিল। বীরচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় রাত্রিতে শিব মন্দিরে যাইবার পথে সেখানে তামাক খাইয়া কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করিয়া শিব মন্দিরে যাইতেন। এক দুর্যোগপূর্ণ রাত্রে তিনি ঐ বাড়িতে পৌঁছিয়া তামাক দিতে বলিয়া দাওয়ায় বসিয়া আছেন এমন সময় দেখেন গৃহস্বামী হুঁকাটি তাঁহার হাতে দিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি কোন কাজে ব্যস্ত আছেন ভাবিয়া কোন কথা না বলিয়া আপন মনে তামাক খাইয়া মন্দিরের দিকে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় গৃহস্বামী ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "গোঁসাই ঠাকুর, তামাক না খাইয়া মন্দিরের দিকে যাইতেছেন যে?" গোঁসাই বলিলেন, 'কেন? তুমি যে তামাক দিয়া গেলে আমি তামাক খাইলাম, দেখ! কলিকা এখনও গরম আছে।" গৃহস্বামী আশ্চর্য হইয়া গেলেন। গোঁসাই ঠাকুর হাসিমুখে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার বুঝিতে অসুবিধা হইল না যে, শিবঠাকুর স্বয়ং তাঁহাকে তামাক সাজিয়া দিয়া গিয়াছেন।

বীরচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় "মদনগোপাল ও রাধারাণী" প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুরের নিত্যসেবা আজও চলিয়া আসিতেছে। কয়েক পুরুষ আগে রাধারাণী মূর্ত্তি চুরি যায়। যে চোর রাধারাণী বিগ্রহ চুরি করে সে দিশাহারা হইয়া সারারাত্রি গ্রামের পথে ঘোরাঘুরি করিতে থাকে। প্রাতঃকালে রাধারাণী বিগ্রহ সহ চোর ধরা পড়ে—ঐ গ্রামের অপর পাড়ায়। যাঁহারা বিগ্রহ উদ্ধার করেন তাঁহারা ঐ বিগ্রহ

গোপীনাথের পাশে স্থাপন করেন। জানিতে পারিয়া গোস্বামী বংশের সকলে স্থির করেন, যে রাধারাণী গোপীনাথের পাশে স্থাপন করা হইয়াছে, তাহা আর মদনগোপালের পাশে স্থাপন করা যায় না। আজও গোপীনথের পাশে দুইটি রাধারাণী পূজিতা হইতেছেন।

এতদিন পর্যন্ত মদনগোপাল একাই ছিলেন। সন ১৩৭৯ সালের অক্ষয়তৃতীয়ার দিন সাড়ম্বরে নূতন রাধারাণী মূর্ত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। ঐ নূতন রাধারানী মূর্ত্তি স্থাপনের একটি ইতিহাস আছে। শ্রীইন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবিমলেন্দু গোস্বামী বর্দ্ধমানে আসিয়া ব্যবসা করিতেন এবং পরে বর্ধমান শহরের রেলপারে লোকোর মোড়ের কাছে গৃহ নির্মাণ করিয়া বসবাস করেন। কিছুদিন পরে ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ব্যবসা বন্ধ করিয়া দেন। তাঁহার দশবৎসরের এক পুত্র শ্রীপ্রণবকুমার গোস্বামী বর্ধমান বাসার ঠাকুর ঘরে গোপীনাথ ও রাধারাণীর ফটোর সম্মুখে বসিয়া প্রতিদিন গীতাপাঠ করে। একদিন গীতাপাঠ করিবার জন্য ঠাকুর ঘরে ঢুকিতেই দেখে বৈদ্যুতিক আলোর সুইচ অফ (Off) থাকা অবস্থায় আলো জলিয়া উঠিল। সে অভিভূত হইয়া তন্ময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অপর একদিন ঠাকুরঘরে ঢুকিয়া গীতাপাঠ করিতে বসিয়া শুনিতে পায় রাধারাণী গোপীনাথকে বলিতেছেন, "বিমলের ব্যবসাটা উঠে গেল, একটা কিছু ব্যবস্থা করে দাও।" গোপীনাথ উত্তর দিতে-ছেন, "সময় হলেই ব্যবস্থা করব।" এদিকে বিমল বাবু ও কিছু স্বপ্নাদেশ পাইয়া স্থির করেন সামন্তিতে মদন গোপালের পাশে রাধারাণী স্থাপন করিবেন। বহু বাধা-বিপত্তি অপেক্ষা করিয়া সাড়ম্বরে রাধারাণী স্থাপিতা হয়েছেন।

শ্রীইন্দ্রনারায়ণ গোস্বামীর পিতা ৺নিতাইসুন্দর গোস্বামী ছিলেন সুগায়ক এবং তিনি অতি অদ্ভুত ভাগবতপাঠ করিতেন। তাঁহার কণ্ঠ ছিল সুমধুর। তিনি আহম্মদপুর নিবাসী শ্রীউমাচরণ চক্রবর্ত্তীর নিকট উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ইং ১৯১৩।১৪ সালে সামন্তির পাড়ায় পাড়ায় রেষারেষি করিয়া যাত্রা গানের আসর বসিতেছিল,

সেই সময় এক সন্ধ্যায় পাড়ায় ৪।৫ জন যুবক তাঁহার নিকট আসিয়া বলে, "আপনি গান বাজনা ভাল বোঝেন, আপনাকে আগামীকাল বর্ধমান যাইয়া এমন একটি যাত্রার দল বায়না করিয়া আসিতে হইবে, যাহাতে আমাদের পাড়া শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়। "তিনি তাহাদের প্রস্তাবে রাজী হন। পরদিন প্রাতে উক্ত ৪।৫ জন যুবক সহ হাঁটা পথে বর্ধমানে পৌঁছিয়া শ্যামসায়ারের ধারে আসিয়া সঙ্গীদের বলেন, "তোমরা জলটল যা খাবার খেয়ে এস, আমি এই ঘাটে স্নান আহ্নিক সেরে নেই। তিনি স্নান আহ্নিক শেষ হইলে দেখেন যুবক কয়টি স্থান ত্যাগ করে নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা উত্তর দেয়, "আমাদের কাছে টাকা পয়সা কিছু নাই।" তিনি বিস্মিত হইয়া বলেন, "সে কি? তোমরা যাত্রার দল বায়না করতে এসেছ। আমি ত শুধু দল নির্ব্বাচন করে দেব। আমি নিজেও ত কোন টাকাকড়ি আনি নাই। এখন কি করা যায়? দেখা যাক, গোপীনাথ কি করেন।" তাঁহার ঝুলিতে একটি তামার পয়সা ছিল। একজনকে দিয়া এক পয়সার চিনি আনাইয়া সকলে একটু একটু ভাগ করিয়া লইয়া শ্যামসায়ারের জল পান করিয়া বলিলেন, "তোমরা খোঁজ করিয়া দেখ, আজ রবিবার ছুটির দিন, কোথাও গানের আসর বসিয়াছে কি না।" খোঁজ করিতেই দেখা গেল কুমিরখোলার জমিদার বাড়ীতে (বর্ত্তমানে খোস বাগানের নারিকেল বাগান) কাশীর ওস্তাদ আসিয়াছেন এবং সেখানে গান বাজনা হইতেছে। শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সেই আসরে উপস্থিত হইয়াছেন। গোস্বামী মহাশয় বাহির হইতে সঙ্গীদের সহিত গান বাজনা শুনিতে লাগিলেন। একটি গান শেষ হইলে, সকলের হাততালি থামিলে, গোস্বামী মহাশয় বাহির হইতে বলিলেন, "ওস্তাদজী, আপনার যন্ত্রের পঞ্চম সুরটা একটু নীচু করিলে আরও ভাল হইত।" সকলের দৃষ্টি বহিরাগতের দিকে আকৃষ্ট হইল এবং সকলের আহ্বানে সঙ্গীগণ সহ গোস্বামী মহাশয় সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। সকলের অনুরোধে ওস্তাদজীর যন্ত্র লইয়া, সুর ঠিক করিয়া লইয়া, সুর, তাল ও লয়ের বন্যা বহাইয়া দিলেন। যিনি পাখোয়াজ

বাজাইতেছিলেন, তিনি পাখোয়াজের ঠেকা ধরিতে পারিলেন না। সকলে মুগ্ধ হইয়া অনুরোধ করিলেন, যাহাতে পাখোয়াজ সহযোগিতায় আর একখানি গান করেন। গোঁসাইজী বলিলেন, "আমরা অন্য কাজে বিদেশ হইতে আসিয়াছি, এখনও জল পর্যন্ত খাওয়া হয় নাই, কাজ শেষ করিয়া আমাদের বাড়ী ফিরিতে হইবে, সুতরাং ওস্তাদজীই আপনাদের গান শুনাইবেন। আমাদের যাইতে দিন।" গৃহস্বামী এসকল কথা শ্রবণ করিয়া, তাহাদের সভাস্থল হইতে ভিতরে লইয়া যাইয়া কি উদ্দেশ্যে বর্দ্ধমানে আসিয়াছেন জানিয়া লইয়া, টাকা পয়সা দিয়া লোক পাঠাইয়া যাত্রাদলের বায়না করাইয়া দিলেন এবং তাঁহাদের বাড়িতে সকলকে রাখিয়া তিন দিন গানের আসর চলিবার পর উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া নিজ ব্যয়ে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

একবার পুঁইনি পলাসীর যশ বাড়ীতে মাসাধিককাল ভগবত পাঠ করিতেছিলেন। প্রতিদিন বৈকাল হইলেই পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে অগণিত নরনারী ঐ ভাগবত পাঠ শুনিতে আসেন। সরঙ্গ বঁইচি গ্রামের বিশিষ্ট পণ্ডিত নৃসিংহ সরস্বতী ভাগবত পাঠের উপর অত্যন্ত চটা, তাঁহার মত হইতেছে ভাগবত পাঠ করিয়া কোন ফল হয় না। উহার ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। যাহারা তাঁহার গৃহের সম্মুখ দিয়া ভাগবত পাঠ শুনিতে যান, তাহার মধ্যে চেনা লোক দেখিলেই তাঁহাকে বলেন, "কি শুনিতে তোমরা রোজ রোজ যাও। ভাগবত শুনিবার আগ্রহে কোন রকমে তাঁহার প্রশ্নের জবাব দিয়া সকলেই অগ্রসর হন। একদিন এক ব্যক্তি উত্তর দেন, "না পণ্ডিত মহাশয়, ব্যাখ্যা অতি চমৎকার হয়, আপনি শুনিলে বুঝিতে পারিবেন।" পণ্ডিত মহাশয় উত্তর দিলেন, "যশ মহাশয় আমাকে ত আমন্ত্রণ করেন নাই, আমি যাই কি ভাবে?" উক্ত ব্যক্তি সেই সংবাদ যশ মহাশয়কে জানাইলে, পরদিন যথাবিধি আমন্ত্রণ করিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে সেখানে লইয়া যাওয়া হয় এবং উপযুক্ত আসনের ব্যবস্থা করা হয়। ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিবার পর পণ্ডিত আসনের ব্যবস্থা করা হয়। ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিবার পর পণ্ডিত মহাশয় গোস্বামী মহাশয়কে

বলেন, "আপনি বয়সে তরুণ হইলেও আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছেন আমার ধারণা ছিল, আমি ভাগবতের ব্যাখ্যা ভালভাবেই জানি কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার সে ধারণা ভুল। যাহা হউক, আমার বাড়ীতে আমার বৃদ্ধামাতা আছেন তাঁহাকে আপনার ভাগবত পাঠ শ্রবণ করাইতে বিশেষ আগ্রহ হইতেছে। "পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় উত্তর দিলেন, "এখানকার কাজ শেষ হইলে, অবশ্যই আপনার মাতাকে পাঠ করিয়া শুনাইব।" যথাসময় পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ীতে ভাগবৎ পাঠ শেষ হইলে, পণ্ডিত মহাশয় গোস্বামী মহাশয়কে ১০১·০০ টাকা পারিশ্রমিক দিতে আসিলে তিনি বিনীতভাবে বলিলেন, আপনার মাতৃদেবীকে পাঠ শুনাইয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিব না।" দক্ষিণান্ত না করিলে কার্যসিদ্ধি হয় না। সেজন্য মাত্র একটি টাকা গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ও গোস্বামী মহাশয়ের সম্মানার্থে গোরুর গাড়ী করিয়া, ডাউল, চাউল, বাসন, সোনা, রূপা প্রভৃতি জিনিষপত্র তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন।

আর একবার দিনাজপুর জেলায় নিতাই সুন্দর গোস্বামী ভাগবত পাঠ করিতে যান। সেখানকার পাঠ শেষ হইবার দুই তিন দিন পূর্বে আইহাই গ্রামের জমিদার জানকী নাথ রায় তাঁহার বাড়ীতে পাঠ করিবার জন্য আমন্ত্রণ পাঠান এবং নির্দিষ্ট দিনে সেখানে তাঁহাকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করেন। সেখানে পৌঁছাইবার পর তিনি গোস্বামী মহাশয়কে রামায়ণ পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। ইতিপূর্বে তিনি কোন দিন রামায়ণ পাঠ করেন নাই। তিনি জমিদারকে একখানি. কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ সংগ্রহ করিয়া দিতে বলিলেন। সকাল হইতে অধিক বেলা পর্যন্ত ঐ রামায়ণ হইতে প্রতিদিন সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া সন্ধ্যার পর নিজ রচিত সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা সহ মাসাধিক কাল রামায়ণ পাঠ করিয়া সকলকে স্তম্ভিত করেন। তিনি মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

৮ই শ্রাবণ ১৩৫৩ সাল বড়বেলুন বাটী হইতে বিবাহ সম্পন্ন হইবার পর, আশ্বিন মাসে পূজার পর গুরুদেবের সহিত চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া আমাদের

পরমারাধ্যা মাতৃদেবী সামন্তি হইতে প্রথম শ্বশুরালয়ে আসেন। আসিবার পথে "বড়মার" মন্দিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই তাঁহার বুক গর্বে ভরিয়া উঠে। বালিকাবধূর প্রথমেই মনে আসে, "আমাদের কত বড় ঠাকুর! এত বড় ঠাকুর পূর্বে ত কখনও দেখি নাই।" সে সময় কার্ত্তিক অমাবস্যায় পূজার জন্য "বড়মার" মূর্ত্তি নির্মানের কাজ চলিতেছিল। সকলের অলক্ষ্যে তিনি মাতৃ চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। দেবী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহার মনে আর কোন চিন্তা স্থান পাইল না। কত দিনে মায়ের সেবা করিতে পারিবেন, তাঁহার জন্য নিজ হাতে ভোগ রন্ধন করিয়া দিতে পারিবেন, এই সকল চিন্তাই তাঁহার মনে আসিতে লাগিল। সাংসারিক অবস্থা যে ভাল নয়, সে কথা একবারও তাঁহার মনে হইল না।

কিছুদিন পরে তাঁহার কাকা শ্রীদেবনারায়ণ গোস্বামী কাব্যস্মৃতি-তীর্থ, তর্করত্ন, কালেশ্বর রাখালদাস চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তিনি অনিমাদেবীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। গুরুদেবের বড়বেলুনে সাংসারিক অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত ব্যথা লাগিল। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে নিভৃতে পাইয়া অনুশোচনা করিতে করিতে বলিলেন, "দাদা কি দেখিয়া তোর এখানে বিবাহ দিলেন, কে জানে।" এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ আর্দ্র হইয়া আসিল। বালিকা কাকার চোখে জল দেখিয়া প্রথমে কাঁদিয়া ফেলিলেন। পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করিয়া বলিলেন, "কাকা, আমাদের কত বড় ঠাকুর।" কাকা ভ্রাতুষ্পুত্রীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া স্নেহভরে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন।

বড়বেলুনে স্থায়ী ভাবে গুরুদেবের অবস্থান

ইং ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে গুরুট্রেনিং পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া দেবগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদান না করিয়া ১লা জানুয়ারী, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বড়বেলুন ১নং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। স্কুলে যোগদান করিয়াই উহার সংস্কার সাধনে ব্রতী হন এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করিলেও স্কুলের সকল দায়ভার নিজে গ্রহন করেন।

তিনি বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের জন্য বর্ধমান জেলা স্কুল বোর্ডে দরখাস্ত করেন। "বড়বেলুন বড়কালী ফ্রী প্রাইমারী স্কুল" নাম করন করার অনুরোধ বোর্ড মঞ্জুর করেন।

বড়বেলুনে ফিরিয়া আসায় "বুড়ামাতা" যেন তাঁহার কানে কানে বলিলেন,

"ওরে বাছা ? মাতৃকোষে রতনের রাজি
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি ?"

দীর্ঘদিনের পর গুরুদেব বড়বেলুনে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য পিতার নিকট ফিরিয়া আসিলেন। সংসারের নানা অভাব ও অনটনের মধ্যে তাঁহাকে চলিতে হইত। এই স্থানে বলা আবশ্যক গুরুদেব ইতিপূর্বে যখন মধ্যে মধ্যে বড়বেলুনে আসিয়া থাকিতেন সেই সময়কার সহপাঠী, ও বন্ধুদের মধ্যে শ্রীজগদানন্দ পাল, শ্রীসুধীর কুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুবীর কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিসাধন মিত্র, শ্রীগুরুপদ গঙ্গোপাধ্যায়, ৺তিন কড়ি পণ্ডিত, ৺ভবানী প্রসাদ দত্ত, শ্রীক্ষুদিরাম দাঁ, শ্রীসুধীর কুমার রায় (মদন) ও ফেলা সরকারের নাম উল্লেখযোগ্য।

ইহা ছাড়া গুরুদেবের দারিদ্রময় জীবনের খুঁটি হিসাবে ৺ভবানী প্রসাদ দত্ত ও শ্রীপাঁচকড়ি রায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য

সাংসারিক জীবনে অর্থের প্রয়োজন সুনিশ্চিত। আপন-ভোলা আমাদের গুরুদেব অর্থকরী দিকে উদাস থাকায় সংসার চালাইতে অর্থের প্রয়োজন হইলে এই দুই ব্যক্তি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। অন্ধের যষ্টির মত গুরুদেবের অভাব অনটনের অবলম্বন হইলেন শ্রীপাঁচকড়ি রায়। ইনি যদিও তাঁহার মন্ত্রশিষ্য নহেন তথাপি প্রয়োজনে অর্থ সাহায্যকারী ও ভক্ত হিসাবে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহার নিকট হইতে যে অর্থ সাহায্য প্রয়োজনে গ্রহণ করেন তাহা ধীরে ধীরে পরিশোধ করিয়া ঋণমুক্ত হন। জানি না, রায় মহাশয় গুরুদেবকে কোন দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। তবে শুনিয়াছি পাঁচকড়ি বাবুর সকল কাজে আমাদের গুরুদেব অর্জ্জুনের সারথী শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তাঁহার পরামর্শ দাতা। উভয়ের ভাবের আদান প্রদান সকলকে মুগ্ধ করে।

সহপাঠী বন্ধুদের মধ্যে শ্রীজগদানন্দ পাল ও শ্রীসুধীর গাঙ্গুলী গুরুদেবের "কে বা কি"—বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, ইঁহারা কতকটা একাত্ম ও অভিন্ন হৃদয়।

"বুড়ামাতার আদ্য কথা" প্রকাশের ইতিহাস

সন ১৩৫৪ সালের ২০শে ভাদ্র গুরুদেবের পিতৃবিয়োগ হয়। পিতাকে হারাইয়া তিনি সে সময় দিশাহারা অবস্থায় পড়েন। শিক্ষকতা বৃত্তিতে "গৃহে যাইয়া পাঠ দান" দরিদ্র শিক্ষকদের অন্যতম আয়ের পথ। তিনি সে সময় মানষিক অবস্থার জন্য ঐ আয়ের পথ ত্যাগ করিয়া ঘোর দুর্দিনে পতিত হন। এই সময় তিনি তাঁহার সহপাঠী বন্ধু শ্রীজগদানন্দ পাল মহাশয়ের নিকট "৺বুড়ামাতার আদ্য কথা" পুস্তকখানি ছাপাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি একশত টাকা এবং পাণ্ডুলিপিখানি তাঁহার নিকট কলিকাতায় পাঠাইতে লিখিলেন। সেই ঘোর দুর্দিনে দিন চলা ভার, তদুপরি একশত টাকার প্রয়োজন,

নচেৎ পুস্তকখানি প্রকাশ করা যায় না।* মহাভাবনায় গুরুদেব দিন যাপন করেন। একদিন তিনি তাঁহার অন্যতম বন্ধু শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়ের মাতা ৺রাসেশ্বরী দেবীর (স্বামী শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়) নিকট মনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ৺রী মায়ের ইচ্ছায় তিনি তৎক্ষণাৎ গুরুদেবের হাতে একশত টাকা দিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করেন। শুধু কি তাই? ৺রী মায়ের পূজা আগতপ্রায়। গুরুদেবের সকল অবস্থা জানিয়া পূজা উপলক্ষে পাঁচ মন ধান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দান করিয়া গুরুদেবকে দুর্ভাবনার হাত হইতে মুক্ত করিলেন।

দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপানোর কাজে সাহায্য করিয়াছেন গুরুদেবের পরমস্নেহাস্পদ ও ভক্ত শ্রীশ্যামাপদ দত্ত মহাশয়।

বিবাহের পর গুরুদেবের কিছুদিন অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্য দিয়া দিন কাটিতে লাগিল। সকলের ধারণা হইল তাঁহার মস্তিষ্কের বিকৃতি হইয়াছে। তিনি সুবিধা পাইলেই বড়মার মন্দির চত্বরে বসিয়া থাকেন। তাঁহার চিকিৎসা চলিলেও প্রবল জ্বর ও মাঝে মাঝে নাক মুখ দিয়া রক্তপাত হইতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে, অবজ্ঞার চোখে দেখিতেন, সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি আত্মভোলা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার আচার ব্যবহার উন্মাদের ভাব পরিলক্ষিত হইল। তিনি কি উন্মত্ত হইয়াছিলেন? না, ইহা প্রকৃত উন্মত্ততা নয়, বৈরাগ্যের প্রবলতায় জীবের হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হয়, ইহা তাহারই অভিব্যক্তি। সাধারণ মানুষ পাগল জ্ঞানে ইঁহাদিগকে উপেক্ষা বা পরিহাস করে, কিন্তু এই প্রকার বৈরাগ্যোন্মাদ কয়জন ব্যক্তির হইয়া থাকে? শ্রীশ্রীভোলানাথ গিরি মহারাজের এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল।

(শ্রীশ্রীভোলানাথ চরিতামৃত—তৃতীয় সংস্করণ-পৃ১৭)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শৈশবাবস্থায় ঐরূপ ভাবাবেশ সমন্ধে Romain Rolland তাঁহার রচিত "The life of the Ramakrishna" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন "From that time the

ecstasies (ভাবাবেশ) became more frequent. In Europe the case would have been foredoomed and the child would have been placed in a lunatic asylum under a daily douche of psycho-therapy."

"অবশ্যম্ভাবিভাবানং প্রতিকারো ভবেদ যদি।
তদাদুঃখের্ণ লিপ্যেরন্নল-রাম-যুধিষ্ঠিরাঃ॥"

অবশ্যম্ভাবী যে ভোগ তাহার প্রতিকার সম্ভব হইলে নলরাজা, রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরকে কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। যে যাহা ভোগ করিবার জন্য এ দেহ ধারণ করিয়াছেন, সেই প্রারব্ধ ভোগ তাঁহাকে করতেই হইবে। ইহার অন্যথা শ্রীভগবানও করিতে পারেন না। গুরুদেবের ক্ষেত্রেও সাংসারিক সুখ-দুঃখের মধ্যেই মহামায়ার সহিত নিত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। এই সম্বন্ধ স্থাপন কি দূরূহ কর্ম্ম, যিনি এই পথের পথিক তিনি ব্যতীত কেহ অনুধাবন করিতে পারিবেন না।

সাংসারিক সুখ দুঃখ উভয়ই শ্রীভগবানের দান, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হইলে, তবেই জীবন শান্তিময় হয়। যে সাধক কায়মনবাক্যে শ্রীভগবানের উপাসনায় তন্ময় হন বা হইতে চেষ্টা করেন। শ্রীভগবান তাঁহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য অলক্ষ্যে সংগ্রহ করিয়া দেন এবং সাধক উহা উপলব্ধি করিয়া ভগবানের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে সক্ষম হন।

শ্রীরামচন্দ্রের গুরুদেব বশিষ্ঠমুনি একশত পুত্রের পিতা হইয়াও ব্রহ্মর্ষি অর্থাৎ ঋষিশ্রেষ্ঠ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। গার্হস্থ্য জীবনই শ্রেষ্ঠ। স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজনের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নেই—এ মিলন ক্ষণস্থায়ী, কয়দিন পর সকলেই জগতের মায়া ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যাইবে—প্রকৃত সুহৃৎ, প্রকৃত আপনজন প্রেমময় ভগবান—এইরূপ বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া, গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করিয়া, যিনি শ্রীভগবানের সহিত নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন, তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষ দুর্লভ।

এবার আসুন আমরা বালিকা বধূর দিকে দৃষ্টিপাত করি। সংসারে যাঁহার স্বামী, শ্বশুর ও এক দেওর ছাড়া আর কেহ নাই, তাঁহার স্বামীর ঐরূপ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার ফলে "বড়মার" প্রতি তাঁহার আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইল। তিনি বড়মার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রাখিয়া হাসিমুখে সংসারের কর্তব্য কর্ম করিয়া চলিলেন। এই ভাবে প্রায় এক বৎসর অতিবাহিত হইলে ১৩৫৪ সালের ২০শে ভাদ্র শনিবার প্রায় আড়াই মাস রোগ ভোগের পর গুরুদেবের পিতৃদেব দেহত্যাগ করেন। সে সময় তাঁহার আথিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। টালিগঞ্জে পিতৃদেবের নামে যে জমি ইতিপূর্বে ক্রয় করিয়াছিলেন,, তাহা তাঁহার পিতা ইতিপূর্বেই বিক্রয় করিয়া দেন। কোন রকমে পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপ্ত করিবার পর বুড়ামার পূজায় পরদিন যে ঘটনা ঘটে তাহার উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না।

তাঁহার পিতৃদেবের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইবার জন্য বিদেশ হইতে বুড়া মায়ের পূজার পর দিন ১০।১২ জন স্ত্রী-পুরুষ সন্ধ্যার দিকে আসিয়া পৌছান। তাঁহারা উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। পথ-শ্রমে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত অবস্থায় তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন। এতগুলি লোক এবং তৎসহ ১৮।২০ জন দূরাগত অতিথি যাঁহারা পূর্ব হইতেই বাড়ীতে ছিলেন, সকলের আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঘরে বিশেষ কিছু সংস্থান নাই। দোকানে ধার মিলিল না। গুরুদেব কাহাকেও কিছু না জানাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া "বড়মার" মন্দিরে আসিয়া মায়ের নিকট কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "মা, তুই এখানে থাকতে আমার ঘরে এতগুলো লোক অনাহারে কাটাবে।.... তুই কেমন মা!..." মায়ের নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। কতক্ষণ সেই অবস্থায় ছিলেন তাঁহার খেয়াল নেই। এই অবস্থায় মা তাঁহাকে জানাইলেন —"কুলুংগিতে সাত টাকা আছে নে।" তিনি বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন। কুলুংগিতে দেখেন সাতটি সিন্দুর মাখান রূপার টাকা। উহা পরিষ্কার করিয়া লইয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া বাড়ী

ফিরিলেন। আমাদের অন্নপূর্ণা মা বিভিন্ন স্থানে রাখা, চাউল, ডাউল সংগ্রহ করিয়া খিচুড়ী রাঁধিয়াছেন এবং যৎসামান্য উপকরণ প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। আগন্তুকগণ নিদ্রাভিভূত হইয়া শুইয়া আছেন। তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত সহকারে ভোজন করাইলেন, তাঁহারা সকলে এক-বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "এরূপ অপূর্ব খাদ্য আমরা পূর্বে কখনো খাই নাই।" আমাদের আরাধ্যা মাতৃদেবী সঙ্কটে বুড়ামাতার কৃপায় দ্রৌপদীর ন্যায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

সন ১৩৫৪ সালে ৬ই আশ্বিন বড়বেলুন গ্রামে স্বাধীন ভারতে প্রথম বড়বেলুন ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইবার পর শ্রীমোহিনী মোহন চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় গুরুদেবের প্রবল জ্বর এবং মাঝে মাঝে নাক-মুখ দিয়া রক্তপাত হইতেছে। এইরূপ অবস্থাতেই "বড়মাকে" উৎসর্গীকৃত দুইটি মালা হস্তে সভাস্থলে প্রবেশ করিয়া একটি মালা সভাপতির গলায় এবং অপর মালাটি নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডাঃ সত্যপ্রকাশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গলায় পরাইয়া দিয়া স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। কবিতাটি নিম্নরূপ :

শুভ আহবানে বিজয় মাল্য,
দিনু আজি তব গলে।
সার্থক হউক সাধনা তোমার,
মায়ের আশিস বলে।
নূতন পথের যাত্রী তুমি গো,
আছে সেথা বহু বাধা।
ছিন্ন কর গো সব শৃঙ্খল,
দূর কর আবিলতা॥
দূর কর ওগো স্বার্থপরতা,
দূর কর অবিচার।
ফিরে নিয়ে এস মানবের কাছে,
মানবের অধিকার॥

বন্ধ কর গো শোষণ পীড়ন,

ধনীর অত্যাচার।

দেখ চারিধারে গরীবের ঘরে,

উঠে সদা হাহাকার॥

তাই মনে প্রাণে চেয়েছিল সবে,

তোমার নির্বাচন।

মায়ের আশিষে সবার পরশে,

শান্তি হইল মন॥

আজি উৎসব, মঙ্গল দিনে,

গাই তব জয় গান।

'বড়কালীমা'র আশীর্ব্বাণীতে,

বিজয়ী হউক প্রাণ॥

(বড়বেলুন, বড়কালীতলা, ৮ই আশ্বিন, ১৩৫৭ সাল)

বড়বেলুন নিবাসী শ্রীমৃতঞ্জয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র শ্রীসুধীর কুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত গুরুদেবের যে বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে, এইরূপ বন্ধুত্ব অতি বিরল। তাঁহার জন্ম সন ১৩২৯ সাল ৯ই ফাল্গুন বুধবার বেলা ৯টা। পিতার অকাল মৃত্যুতে দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া সাংসারিক সকলপ্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগের মধ্য দিয়াও সুধীরবাবুর ৺শ্রী বড়মার প্রতি আকর্ষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। তিনি শৈশবকাল হইতেই সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। বহু যাত্রাদলে নাটকে নিজে গান রচনা করিয়া উহা নিজে গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। তাঁহার রচিত কবিতা, চণ্ডীর পালাগান এবং ৺শ্রী বুড়ামার উদ্দেশ্যে রচিত গান, তাঁহার নিজ কণ্ঠে যিনি শুনিয়াছেন তিনিই অভিভূত হইয়াছেন। তাঁহার আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য তাঁহার রচিত বহু মূল্যবান সম্পদ সাধারণের অগোচরে থাকিয়া গিয়াছে। তিনি মায়ের পূজার সময় নূতন গান গাহিয়া সকলকে আত্মহারা করিয়া তোলেন। তাঁহার ঐরূপ দুইখানি গান দেওয়া হইল।

(১)

দুঃখের আগুনে এজীবন ধূপ
তুমি ভাল করিয়াছ ধরায়ে।
পুড়ে হই ছাই কোন ক্ষতি নাই
গন্ধত যাই ছড়ায়ে ॥
না পিষিলে কভু আখের দণ্ড
রসে কি পূর্ণ হয়গো ভাণ্ড।
না চাঁছিলে ঐ খেজুর কাণ্ড
রস আপনি পড়ে কি গড়ায়ে ॥
মুষলের ঘা না পেলে ধান্য
পারিত জগতে যোগাতে অন্ন ?
আবরণ তার করিয়া চূর্ণ
হাওয়া দিয়ে দাও ওড়ায়ে ॥
কাঠুরিয়া নাই করিলে ছেদন
চন্দন সুবাস রহিত গোপন।
স্বর্ণ পিণ্ড হোত না ভূষণ,
না গড়িলে পিটায়ে পোড়ায়ে ॥
জীবনের শেষে মোর পোড়া ছাই
তব রাঙা পায়ে পায় যেন ঠাঁই।
মরনের আগে মিনতি জানাই
যেন নিয়ো না চরণ সরায়ে।

(২)

রাখ রাখ রাঙা পায়
ওগো মা আমায়।
অসার মায়ায় ভুলে ছিনু মা তোমায় ॥
সংসারে বড় জ্বালা
জ্বলে মরি দিবা নিশি।

মা তোর চরণ তলে

জ্বালা জুড়াইতে আসি॥

তুই যদি দিবি ঠেলে

নেবে কে মা কোলে তুলে।

দীন সুধীর বলে

তরাবে কে দায়॥

বিল্বপত্তন বা বড়বেলুনের আদি বাস স্থাপয়িতা মহাসাধক শ্রীভৃগুরাম স্বামী ও তাঁহার বংশের ভারত খ্যাত পণ্ডিতদের সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানে গুরুদেবের নিরলস পরিশ্রমের কথা সকলেরই সুবিদিত। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর বড়বেলুনের বিভিন্ন বাড়ী হইতে জীর্ণ পুঁথিপত্র ও মূল্যবান চিঠি পত্র উদ্ধার করিয়া অনেক তথ্য তিনি সংগ্রহ করেন। গ্রামের বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্ত্তির বৈশিষ্ট্য, তাঁদের প্রাচীন ইতিহাস এবং সেবাইতদের বংশপরিচয় সংগ্রহ করার জন্য বিশেষ যত্নবান হন। গ্রামের প্রতিটি হিন্দু পবিবারের কুলপঞ্জিকা সংগ্রহ করিবার জন্যও বহু পরিশ্রম করেন। এই সকল প্রচেষ্টার ফলে জানিতে পাবা যায়, বড়বেলুনগ্রাম হিন্দু, বৌদ্ধ, শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধকদের তীর্থভূমি। পরবর্ত্তীকালে এখানে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রভাবও দেখা যায়। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের আরাধনার স্থান ছিল বর্ত্তমান উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক অংশে।

তিনি বাল্যকাল হইতে বড বেলুনের বাহিরে থাকার ফলে "বড়মার" নিত্য পূজা ও কার্ত্তিক অমাবস্যায় এবং অন্যান্য দিবসে বিশেষ পূজা কি ভাবে পরিচালিত হয়, সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। এখানে ফিরিয়া আসিবার পর হইতে মায়ের পূজার ব্যবস্থার যাহাতে উন্নতি হয়, সে বিষয় দৃষ্টি দিলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন ৺রী মায়ের জমি জায়গার অনেক কিছুই কেহ কেহ আত্মসাৎ করিয়াছেন। তিনি ঐ সকল জমি জায়গা উদ্ধারের কাজে ব্রতী হইলেন। এই সকল কার্য করিতে তাঁহাকে প্রচুর পরিশ্রম করিতে হয়। বহু পুরাতন নথিপত্র ঘাঁটিতে হয় এবং মামলামোকর্দমাও অনেক

করিতে হয়। কিন্তু মায়ের উপর ভরসা রাখিয়া একক ভাবে এসকল কার্যে অগ্রসর হইয়া বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া ৺রী মায়ের বহু সম্পত্তি উদ্ধার করেন। পরে সন ১৩৬৭ সালে শ্রীশ্রী৺রী বড়কালী মাতা স্টেট স্থাপিত হয়। এই সকল কার্য করিবার ফলে গ্রামের অনেকেই তাঁহার বিরোধিতা করিতে থাকেন, এমন কি এক সময় তাঁহার প্রাণ সংহার করিবারও চেষ্টা হয়।

তিনি একদিন কার্যোপলক্ষে হাঁটিয়া ভাতার গিয়াছিলেন। সে সময় ঐ পথে বাস ছিল না। ফিরিতে সন্ধ্যা পার হইয়া গেল। সন্ধ্যার পর দেখা গেল গ্রামের কয়েকজন লোক লাঠি, সড়কি লইয়া কোথায় বাহির হইল। গুরুদেব অধিক রাত্রে বাড়ী ফিরিতেছেন, তিনি গ্রামের নিকটবর্ত্তী এক স্থানে আসিয়া বুঝিতে পারিলেন, পিছন দিক হইতে কয়েকজন লোক তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। "কে রে?" বলিয়া পিছন ফিরিয়া দেখেন দুই তিন জন লোক মাঠের মধ্যে পড়িয়া আছে, তাহাদের মধ্যে একজন তাঁহার চেনা বলিয়া অনুমান হইল। তিনি সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। বাড়ীতে পৌঁছাইয়া একজনকে বলিলেন "দেখ ত অমুক বাড়ী আছে কিনা? যদি না থাকে, তাহা হইলে উহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিতে বল। সে অমুক স্থানে পড়িয়া আছে!" সেই ব্যক্তি উক্ত লোকটির বাড়ী যাইয়া দেখিলেন তিনি বাড়ীতে নাই। গুরুদেবের কথামত সংবাদ দিলে, লোকজন যাইয়া দেখিল তিন জন অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহাদের কাছে কয়েকখানি লাঠি ও সড়কি। সেখান হইতে বাড়ী আনার তিন দিন পরে তাহাদের জ্ঞান ফিরিল। পরে প্রকাশ হইল যে, গুরুদেবকে মারিবার জন্য যখন তাহারা অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময় কোথা হইতে এক তীব্র আলো তাহাদের চোখের সম্মুখে পড়ায় তাহারা অজ্ঞান হইয়া যায়।

লীলাময়ীর লীলারহস্য উদ্ঘাটন করা অতি দুরূহ কাজ। তিনি কখন কাহাকে দিয়া কি করান তাহার হিসাব তিনিই রাখেন। এমন কি জীবজন্তুর চাল চলনেও তাঁহার লীলারহস্য প্রকাশ পায়। প্রাণী

বিশেষজ্ঞ ই, পি, জী লিখিয়াছেন যে, পাঞ্জাব প্রদেশ বিভক্ত হইবার একমাস আগে পশ্চিম পাঞ্জাবের অরণ্য হইতে নীল গাই এর দল পূর্ব পাঞ্জাবে এবং পূর্ব পাঞ্জাবের অরণ্য হইতে বণ্য শূকরের দল পশ্চিম পাঞ্জাবের অরণ্যে চলিয়া গিয়াছিল। নীলগাই ও বন্যশূকর উভয়েই নিজ নিজ নিরাপত্তার অঞ্চল চিনিতে ও বুঝিতে ভুল করে নাই।"

(আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৬শে চৈত্র ১৩৮১, বুধবার)

তাহাদের এইরূপ অনুপ্রেরণার মূলে কোন রহস্য আছে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলে, লীলাময়ীর লীলারহস্য প্রকাশ পায়।

ইতিমধ্যে ১৩৫৫ সালে শ্রাবণ মাসে হুগলী জেলার উত্তরপাড়া নিবাসী শক্তি সাধক শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই তিনি জানান, "তোমার ইষ্ট দেবী অমুক এবং ইষ্ট মন্ত্র এই।" গুরুদেব ইতিপূর্বে মায়ের নিকট যে মন্ত্র পাইয়াছিলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেই মন্ত্রের কথা বলিলেন। তিনি তাঁহাকে বেদ দীক্ষা দেন। পরে ১৩৫৫ সালের ৫ই কার্ত্তিক পণ্ডিত প্রবর সারদাচরণ শাস্ত্রী কাব্য ব্যাকরণ জ্যোতিষ তীর্থ, সাংখ্যরত্ন, স্মৃতি পঞ্চানন, ভাগবত ভূষণ, F.T.S., বামাক্ষ্যাপা সংঘের সম্পাদক, বামামিশনের সভাভতি, বামদেবের প্রতিনিধিরূপে তাঁহাকে সস্ত্রীকে কুলাচার দীক্ষা দান করেন। তৎপর হইতে তিনি অত্যাশ্রয়ী হইয়া মহামায়ার পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করেন। পিতৃদেবের আদেশে সংসারী সাজিয়া চার পুত্র এবং চার কন্যার ভরণ পোষণ ও প্রতিদিন আগন্তুক ও অভ্যাগতের আতিথেয়তার ভার বহন করিবার জন্য কত না পরিশ্রম করিতে দেখিয়াছি। সৎপথে অর্থোপার্জনের জন্য প্রতিদিন হাঁটিয়া খেজুর বুনিয়াদ বিদ্যালয়ে যাইয়া মাষ্টারী, লাইফ ইন্সিওরের এজেন্সি, শিক্ষাবৎসরের প্রারম্ভে কয়েক মাস "ভৃগুরাম পুস্তকালয়" নামক পুস্তকের দোকান পরিচালনা করা, প্রভৃতি কাজ করিতে কোন দিন কোনরূপ ক্লান্তি দেখি নাই। তাহার মধ্যে ভৃগুরাম স্বামী প্রবর্তিত বিশেষ বিশেষ দিনে বড়মার বিশেষ পূজা অনুষ্ঠান এবং নিত্য পূজার কোন দিন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। মন্দিরে হোমের কাজ করিতে

বাধা থাকায়, তিনি প্রতি অমাবস্যায় ও অন্যান্য বিশেষ বিশেষ দিনে গৃহে বড়মার বিশেষ পূজা সহ, দশমহাবিদ্যার পূজা, নব গ্রহের পূজা, হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন সুদীর্ঘ ২১ বৎসর যাবৎ। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে তিনি বড়বেলুন বড় কালী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। ২০শে ডিসেম্বর ১৯৬০ সালে খুন্না বানেশ্বরপুর ফ্রি প্রাইমারী স্কুলে যোগদান করে। ঐ স্কুল হইতে ১৯৬১-৬২ সেসনে কাটোয়া জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজে যোগদান করিয়া দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ঐ স্কুলেই যোগদান করেন। সেখান হইতে ১৭ই এপ্রিল ১৯৬৩ খেজুর-ছাতনি কে, এন, জুনিয়ার বেসিক স্কুলে যোগদান করেন। ঐ স্কুলে শিক্ষকতা করিতে করিতে ১৯৬৪ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে শিশুশ্রেণী ও প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য ধারাপাত ও অঙ্ক বই প্রকাশ করেন। ১৯৬৬ সালে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য 'ছোটদের ব্যাকরণ ও রচনা প্রকাশ' করেন। ঐ পুস্তকখানির কয়েকটি সংস্করণ বাহির হয়। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে নূতন পাঠক্রম অনুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য ইংরাজী পুস্তক 'Our A B C' প্রকাশ করেন। সারাদিন উক্ত প্রকার নানা কাজ সমাধা করিয়া রাত্রিকালে পুঁথি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে একখানি অতি মূল্যবান পুঁথি তাঁহার হস্তগত হয়। পুঁথি খানির পাঠোদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়া বিশেষ কোন অর্থ অনুধাবন করিতে না পারায় হতাশ মনোরথ হইয়া শেষ রাত্রে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে মহামায়া আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে বলেন, "আবার পড়, বুঝতে পারবি, তোর কাজে লাগবে।" মহামায়া যাঁহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া চালিত করেন, তিনি সাধারণ সংসারী ব্যক্তিকে ভয় করিবেন কেন? পূর্বে যাঁহারা তাঁহার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন বা তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন বর্তমানে তাঁহারা সকলেই তাঁহার গুণমুগ্ধ এবং তাঁহার বিশেষ অনুরাগী।

এদিকে ৺কৃষ্ণকান্ত ন্যায়পঞ্চাননের প্রতিষ্ঠিত "বিশ্বনাথ ও বিশ্বেশ্বর" শিবমন্দির কালের প্রভাবে ধ্বংস হয়। ঐ শিবমন্দিরে কাহারও পক্ষে প্রবেশ করা কঠিন হইয়া পড়ে। সন ১৩৭২ সালের এক রাত্রে

আমাদের গুরুমাতা দেখিতে পান উক্ত বিশ্বনাথ শিব ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "আর থাকিতে পারি না। মাথা ফেটে গেল। কেহ এতটুকু জল পর্যন্ত দেয় না।" মাতৃদেবী কাহাকেও কিছু না জানাইয়া অতি প্রত্যূষে গঙ্গাজল ও পূজার দ্রব্যাদি লইয়া উক্ত ভগ্ন শিব মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শিবলিঙ্গকে স্নান করাইয়া পূজাদি করিলেন। সেইদিন হইতে প্রতিদিন নিয়মিত উক্ত শিবের পূজাদি করিতেন। পরে গুরুদেবকে সে কথা প্রকাশ করিলে তিনি উক্ত শিব মন্দির পুনঃনির্মাণের চেষ্টা করিতে থাকেন। শ্রীপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুমতিক্রমে পুরাতন মন্দির ভাঙ্গিয়া সন ১৩৭২ সালে উক্ত মন্দির পুনঃনির্মিত হয়। শিব মন্দিরের পুরাতন ফলকে যাহা লিখিত ছিল, তাহা নূতন প্রস্তর ফলকে লিখিয়া স্থাপন করা হয়।

বর্দ্ধমান জেলার খাঁড়গ্রাম নিবাসী শ্রীঅরুণ কান্তি সেন মহাশয়ের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে তাঁহার সহিত গুরুদেবের পরিচয় হয়। সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইতে হইতে আত্মীয়তার রূপ নেয়, ফলে তাঁহার সংসারে যে কোন আপদ-বিপদ ঘটিলে তিনি তাঁহার "রামদা"কেই সর্বপ্রথম জানান এবং তাঁহার নিকট হইতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাইতে দেরী হয় না। এই সুদীর্ঘ ৩০ বৎসর যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পাঠকবর্গের ধৈর্য-চ্যুতি ঘটাইতে পারে, সেজন্য মাত্র দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

গত ৩।৪ বৎসর পূর্বে অরুণবাবুর উন্নত জাতের ১৭টি গাভী এবং ৭টি বলদ পর পর মারা যায়, যে ট্রাকটার দিয়া জমি আবাদ করাইতেন তাহা বিকল হইয়া যায়। জমিতে ঠিকমত ফসল হইল না এবং পুকুরের সব মাছ মারা গেল। চরম দুর্দশার মধ্যে তাঁহার রামদা তাঁহাকে অভয়বাণী শোনাইলেন। তিনি তাঁহার বাড়ী যাইয়া তাঁহার নিজস্ব প্রক্রিয়ায় যেরূপ প্রতিকার করা প্রয়োজন মনে করিলেন, সেই ভাবে প্রতিকার করিয়া তাঁহাকে জানাইয়া আসিলেন যে দুই বৎসরের

মধ্যে সব ঠিক হইয়া যাইবে। অরুণবাবুর ভাষায় তাঁহার ভবিষ্যৎবাণী সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে।

উক্ত অরুণবাবুর এক আত্মীয়ের দুই পুত্র রাজনৈতিক গোলমালে কারারুদ্ধ হন এবং তাঁহাদের মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এরূপ অবস্থায় তিনি গুরুদেবকে বিস্তারিত ভাবে সকল কথা জানাইলে, গুরুদেব উত্তরে জানান, "আগামী অমাবস্যায় মায়ের পূজার পর তোমাকে জানাইব।" অমাবস্যার পর জানান, "বিশেষ কিছু ক্রিয়া করিলে উহারা মুক্তি পাইবে।" উক্ত প্রকার ক্রিয়া করিবার পর জানাইলেন, "পনের দিনের মধ্যে তাহারা মুক্তি পাইবে।" পনের দিন অতিবাহিত হইবার পূর্বেই তাঁহারা সসম্মানে মুক্তি লাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন।

ভৈটা নিবাসী শিবুদাস সুর মহাশয় শৈশবকাল হইতেই গুরুদেবের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি তাঁহার ভক্ত-শিষ্যে পরিণত হন এবং শ্রীশ্রী৺রী বুড়ামাতার প্রতি তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তিনি অতি আন্তরিকভাবে মনে করিতেন গুরুদেবই শ্রীশ্রীবুড়ামা এবং সে কথা প্রকাশ করিতে তিনি দ্বিধা করিতেন না। গুরুদেবের সকল কাজেই তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকিতেন। শ্রীশ্রীবুড়ামাতা, গুরুদেব ও মাতৃদেবীর যে সকল ফটোগ্রাফ আমরা দেখিতে পাই, সেগুলি সবই তিনি বিভিন্ন সময় তুলিয়াছেন। বর্তমান পুস্তকের পাঠকবর্গকে মহাপুরুষ ভৃগুরামস্বামীর আরাধিতা কেতুগ্রামের বিশালাক্ষী দেবীর মূর্তি। তাঁহার ভৈরব শ্রীশ্রীভীরুকের মূর্তি ও কেতুগ্রামের মহাশ্মশানের ছবি উপহার দেওয়ার মানসে শিবুবাবুর সহিত গুরুদেব ও লেখকের সেখানে যাইবার কথা ছিল, কিন্তু মহামায়ার ইচ্ছা অন্যরূপ। ১৩ _ সালের চৈত্র মাসে শিবুবাবু হঠাৎ অসুস্থ হইলে, তাঁহার স্ত্রী সে সংবাদ গুরুদেবকে জানান। তিনি ৺রী বড়মার পূজা করিয়া শিবুবাবুর কল্যাণার্থ হোমের আয়োজন করেন। হোমের কাজ আরম্ভ করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন, শিবুবাবুকে এ যাত্রা রক্ষা করা যাইবে না। ফলে তাঁহার

নামে হোমে পূর্ণাহুতি দেওয়া হইল না। এদিকে চৈত্রে শিবুবাবুর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইলে তাঁহাকে বর্দ্ধমান জেলার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সংবাদ পাইয়া গুরুদেব তাঁহাকে দেখিতে যান। যন্ত্রণা লাঘব করিবার জন্য ডাক্তারেরা তাঁহাকে ঘুমের ঔষধ ইনজেকসন দিয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। গুরুদেব রোগীর শয্যাপার্শ্বে আসিতেই, তিনি চোখ মেলিয়া বলিয়া উঠেন, "রামঠাকুর এসেছ, আমাকে বিদায় দাও, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে বড়মার জন্য কি করিতে পারিলাম জানি না, কিন্তু কেতুগ্রাম আর আমার যাওয়া হইল না, আমাকে ক্ষমা কর। আমাকে বিদায় দাও।" গুরুদেব তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। পরদিন সেখানে গুরুমাতা উপস্থিত হইলে, তিনি আকুলভাবে তাঁহার চরণ দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করেন এবং পরদিন ২৮শে চৈত্র ইহজগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

আমাদের মাতৃদেবী "বড়মার" কৃপায় বহু স্বপ্নাদ্য ঔষধ পাইয়াছেন। অগণিত নরনারী বিনামূল্যে তাঁহার নিকট হইতে সেই সকল ঔষধ লইয়া ব্যবহার করিয়া নানা প্রকার ব্যাধি ও সাংসারিক নানা অশান্তির হাত হইতে রক্ষা পাইতেছেন।

এই সকল ঔষধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁহার মানসিক শক্তি, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, বড়মার প্রতি গভীর বিশ্বাস সম্বন্ধে বহু ঘটনার সহিত ব্যক্তিগত-ভাবে অনেকেই পরিচিত। কোন কোন রোগীকে মায়ের ঔষধ ও কবচ দেওয়ার পরও যখন রোগীর বাড়ী হইতে রোগীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা তাঁহার কাছে পৌঁছিয়াছে, সে সময়ও তাঁহার অসাধারণ দৃঢ় প্রত্যয় এবং মানসিক বিশ্বাস দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। এরূপ বহু ক্ষেত্রে পরে খোঁজ লইয়া জানিয়াছি তাঁহার বিশ্বাসেরই জয় হইয়াছে।

বিপন্নকে সাহায্য করিতে গুরুদেবের অজ্ঞাতসারে নিজের গায়ের অলঙ্কার খুলিয়া দিতেও দেখিয়াছি। পরে গুরুদেব সুদসহ টাকা পরিশোধ করিয়া সেই অলঙ্কার ফিরাইয়া আনিয়াছেন।

ভক্তের ভক্তিতে বিশেষ ক্ষেত্রে গুরুদেব বহু মূল্যবান জীবন রক্ষার্থে

বুড়ামাতার ত্রাণ কবচ দিয়া থাকেন। ইহার প্রতি কেহ কেহ কটাক্ষপাত করিলেও অনেকেই জানেন তিনি উক্ত কবচ অর্থের লোভে দেন না। কেবলমাত্র মাতৃইচ্ছায় উপযুক্ত ক্ষেত্রে উহা প্রাপ্তব্য নচেৎ উহা পাওয়া দুঃসাধ্য। ইহা তাঁহার শিষ্যবর্গ কল্যাণার্থে গ্রহণ করিয়া ধন্য হন। এইরূপ কবচ পাইয়া কতলোক যে কতভাবে উপকৃত হইয়াছেন তাহার সীমাসংখ্যা নাই। অর্থলোভ এই কবচের উদ্দেশ্য হইলে তিনি এ যাবৎ বহু অর্থ রোজগার করিতে পারিতেন। আজও তাঁহাকে উদয়াস্ত পরিশ্রম করিতে হইত না। কেবল হোমের খরচ এবং আনুষঙ্গিক ঔষধপত্রের খরচ কবচ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বহন করিতে হয়। শুনিয়াছি, ইহা গুরুদেবের বংশের ধারা।

গুরুদেব ও গুরুমাতার শ্রীচরণে ভক্তি অবনত চিত্তে আভূমি প্রণতি জানাইয়া, "মহামায়া বুড়ামাতার" কৃপা ভিক্ষা করিয়া, ভৃগুরামস্বামীকে স্মরণ করিয়া লেখার কাজ শেষ করিলাম।

ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি।। ওঁ শান্তি।।।

গুরুদেবের ডাইরীর একখানি পৃষ্ঠা

ওঁমা

সন ১৩৫৯ সাল, ১লা কার্ত্তিক

১লা কার্ত্তিক স্মরণীয় দিন। বড়কালীমাতার আবির্ভাব পূজার দিন হয় কিনা জানবার জন্য একটি রেকাবে ছ'থান সিন্দুর ঢেলে রেখে দিই। পরে পূজা শেষে দেখিতে পাই, ছোট যুগল চরণ তার উপর প্রত্যক্ষ ভাবে পড়েছে। বহু দর্শনার্থী তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন।

সন্ধ্যের পর বড়বেলুনে গুরুদেবের সংরক্ষিত কাগজ পত্র ঘাঁটা ঘাঁটি করিতে করিতে ডাইরীর পাতাটির প্রতি দৃষ্টি পড়ে; সে সময় সেখানে উক্তগ্রামের "গোপীনাথ" মহাপ্রভুর সেবাইত শ্রীসুধীর কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি উহা দেখিয়া বলিলেন "হাঁ, এ ব্যাপার আমরা ও দেখেছি।"

বুড়ামার বন্দনা

জয় জয় আদ্যাশক্তি ভৈরবী ভবানী।
তব মহিমা মোরা কিছু নাহি জানি॥
অসুর সমাজ যবে প্রচণ্ড হইল।
তবে তব রূপ গুণ প্রকাশ পাইল॥
প্রথমে মা মহাকালী দ্বিতীয়াতে তারা।
তৃতীয় ষোড়শী রূপা হলে মা ত্রিপুরা॥
জগদ্ধাত্রী শান্তি মূর্ত্তি সিংহ পৃষ্ঠারূঢ়া।
রিক বসনা দিগম্বরী মহা ভয়ঙ্করা॥
রক্তবীজ বধার্থে মূর্ত্তি তব কালী।
নর কর কোটী বেড়া নর মুণ্ডমালী॥
মহিষাসুর বধে মাগো মহিষ মর্দ্দিনী।
ধূমাবতী ছিন্নমস্তা বগলা ভবানী॥
নব নব রূপ তব নব নব সাজে।
তাথৈ তাথৈ নাচ যোগিনীর মাঝে॥
শঙ্করী মহেশ প্রিয়া বিপদ তারিনী।
ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু অসুর নাশিনী॥
করাল বদনা শ্যামা ওমা মুক্ত কেশী।
লক লক করে জিহ্বা মুখে মৃদু হাসি।
ত্রিনয়না চতুর্ভুজা সর্ব্ববিঘ্ন হরা।
পদতলে মহাকাল ঠিক যেন মড়া॥
শ্মশানে মশানে বাস ডাকিনীর সঙ্গে।
থেই থেই করি তাই নাচিস মা রঙ্গে॥

বন্দনা করি মাগো তব রাঙ্গা পায়।
অধমে রাখিস মাগো তব পদছায় ॥
মনের বাসনা মাগো শোন তবে বলি।
সদা যেন জিহ্বা মোর বলে "কালী" "কালী" ॥
মন যেন থাকে সদা ও রাঙ্গা চরণে।
শক্তিময়ী শক্তি দে 'মা' অধম সন্তানে ॥
গাহি সদা তব নাম ভজন সাধন।
তব আরাধনায় যেন যায় মা জীবন ॥
পাষাণ তনয়া মাগো মহেশ ঘরণী।
বন্দি মা শঙ্করী মাগো গণেশ জননী ॥
পাপী তাপীর তুমি মা অন্তিমের গতি।
ও রাঙ্গা পদে সদা থাকে যেন মতি ॥
এতদূরে সাঙ্গ হলো মায়ের কীর্ত্তন।
"বুড়া মাতা" নামে সবে বল সর্ব্বক্ষণ ॥

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা।
নম স্তস্যৈ নম স্তস্যৈ নম স্তস্যৈ নমো নমঃ ॥" [চণ্ডী]

[বড় কালী মাতার আত্মকথা]

গুরুদেবের বাণী

(১) মুখে এক বলবে কাজে তা করবে না—এটা ভাল নয়।

(২) কাজ করার সঙ্গেই তো ধর্ম্ম করা হচ্ছে, গো।

(৩) ভাল কাজ করবে। খারাপ কাজ করলে আঘাত পাবে।

(৪) আমি সংসারী বলে ভগবান পাব না—এটা ভুল কথা। সংসারের কর্ত্তব্য কর্ম করে চলো—তিনি সহায় হবেন?

(৫) কারো মনে দুঃখ দিও না—কেউ অন্যায় করলে "ন্যায় অন্যায়" বুঝিয়ে দিও।

(৬) "তিনি ত আমার মধ্যেই রয়েছেন"—এটা চিন্তা কর না কেন?

(৭) "তিনি আমি" এক। এটা যদি ঠিক মত গেঁথে নাও তবে মেরে দেবে—কেল্লা ফতে।

(৮) "বাক্" ব্রহ্ম,—ব্রহ্মই আমি। বাক সংযত কর।

(৯) পরের কথা শুনে কোন কিছু করা ঠিক নয়। বিবেক অনুযায়ী কাজ করে চলো—শান্তি পাবে।

(১০) মা বাবাকে প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞানে সেবা করলে, ভগবানের সেবা করা হয়। স্ত্রৈন হয়ে তাঁদের প্রতি দুর্ব্যবহার করলে নরকস্থ হতে হয়। ঈশ্বর বিমুখ হন। এটা মনে গেঁথে নাও।

(১১) ডাকার মত ডাকলে, তিনি তো থাকতে পারেন না—তিনি তোমাতেই প্রতিভাত হবেন।

(১২) শুধু সংসারের কাজ কাজ করলে—আসল কাজ হয় না। তাঁর উপর বিশ্বাস রেখে কাজ করা দরকার।

(১৩) সংসারে এসেছ, কেবল পুত্র কন্যার জন্ম দেওয়াটাই প্রধান কাজ নয়। তাঁর স্মরণ লও শান্তি পাবে।

(১৪) সৎ পথে চলো—অন্যায় করো না। তবেই ত ঠিক ঠিক তাঁর অনুভূতি মিলবে।

(১৫) অভাবে পড়ে সংসারে বিশৃঙ্খলা আপনা থেকেই আসে।

আবার অর্থের প্রাচুর্য্যে হানাহানি (ভাইয়ে-ভাইয়ে) বিশৃঙ্খলা এসে পড়লে—সংযত হতে হয় সকলে মিলে একত্রে বসে, আলোচনা করে নাও। আনন্দ পাবে—তিনি সহায় হবেন।

(১৬) সংসার বড় বিচিত্র—অতি সংযত পুরুষকেও পিচ্ছিল পথে চলতে চলতে পা ফসকে পড়ে যেতে হয়। চরিত্র ঠিক রাখ।

(১৭) এ সংসার কর্মশালা। জ্বালাও অনেক। ধৈর্য্য ধরে বুক বেঁধে চল। বিভিন্ন দিক থেকে আঘাত এসেও কিছু করতে পারবেনা।

(১৮) ন্যায় পথে চলতে শত বিপদ এলেও অন্যায় পথে পা বাড়িও না।

(১৯) বিনা দোষে কেহ তোমার প্রতি অত্যাচার করলেও, ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে প্রতিহিংসা গ্রহণ করো না। শান্তির পথে তার মীমাংসা করে নাও। আনন্দ পাবে।

(২০) ফাঁকি দিয়ে লাভবান হলেও, পরে নিজেকে ফাঁকে পড়তেই হবে—বাবা। এদৃষ্টান্ত অনেক।

(২১) অনেকে বলেন, "ভগবান নাই"। তাঁরা নাস্তিক। তাঁদের কথা শুনো না গো। তিনি সর্বভূতেই রয়েছেন—একটু চিন্তা করে দেখ তো—তাঁর বিকাশ তোমার চারিদিকে রয়েছে—আর রয়েছে তোমার অন্তরে। তবে কেন দিশেহারা হও।

(২২) (ক) মন্ত্র নিয়েছ—জপ কর, জপ কর,—জপাৎ সিদ্ধি।

(খ) মন তোর মন্ত্র বীজটা অঙ্কুর হোক, রক্ষণাবেক্ষণ কর সতেজ হোক—তাঁর সান্নিধ্য লাভ করবে। সহজে তো তাঁকে পাওয়া যায় না— বাবা।

(গ) তোমার দু চোখের মাঝখানে কপালের মধ্যস্থলে জ্ঞান চক্ষু আছে। চোখ বুঁজে মন্ত্র জপ করতে থাক জ্ঞান চক্ষুতে সব দেখতে পাবে—অনুভূতি আসবে—চিন্তা করতে করতে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করবে।

"দুর্জ্জয় পণ, বিপুল সাধনা, পূর্ণ করিবার সাধ।
সে শক্তি পাও, এ "রামকৃষ্ণের" নিয়ত আশীর্ব্বাদ ॥"

গুরুদেব সম্পর্কে কয়েকটি চিঠির অংশ

খেড়ুর—ছাতনী কে. এম. জুনিয়ার হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, বালীগ্রাম নিবাসী শ্রীসত্যনারায়ণ রায় মহাশয় জানাচ্ছেন,—

*** জীবন সমুদ্রের সামান্য দশ বৎসরে রামকৃষ্ণদার সাথে আমার পরিচয়। তিনি সদালাপী, মধুর ভাষী, সত্য ও ন্যায়ের পূজারী, পরোপকারী, সমাজসেবী, নিরহঙ্কারী একজন ধার্মিক শক্তি সাধাক। তিনি চিরনবীন, শিশু প্রেমিক—তাঁর অন্তর শিশুর মতো সরল। তিনি জীবন সংগ্রামে একজন বিজয়ী সেনা নায়ক। তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক। শিশুদিগকে আদর্শ নাগরিকরূপে গড়ে তোলার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। সমাজের অজ্ঞ দরিদ্র জন সাধারণের জন্য তিনি বহু শ্রম দান করেছেন * * *। আমরা যেন তাঁর মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সত্য, ন্যায় ও প্রগতির দিকে এগিয়ে যেতে পারি। গচ্ছ ভবান্ ? শিবস্তে পন্থাঃ।

বড়বেলুন গ্রামের শ্রীসুধীর কুমার গাঙ্গুলী (বর্ত্তমান ঠিকানা—১১২ বেলগাছিয়া রোড; কলিকাতা-৪) জানাচ্ছেন :—

"রামকৃষ্ণ" সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, আমি, ভবানী প্রসাদ দত্ত ও রামকৃষ্ণ এই তিন জনের একের অন্য ছাড়া এক তিলও চলতাম না। অল্প বয়স হতেই ঐশ্বরিক চিন্তার প্রভাবে সে আমাদের প্রভাবিত করেছিল। * * * যতই দেখেছি ততই তার প্রতি বন্ধুত্বের পরিবর্ত্তে গুরুত্বের দিকেই ঝুকে পড়েছি * * *। তাহার বহুমুখী প্রতিভা, বহু গ্রামীন উন্নতি, দরিদ্র ছাত্রদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করতে বিমুখ দেখি নাই।—বন্যার্ত্তের কাতর আহ্বান, পীড়িতের আর্ত্তনাদে সব সময়ই তাকে হাসিমুখে সেবারহাত বাড়িয়ে দিতে দেখেছি। * * * রাজনৈতিক জীবনেও তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৪২এর

আন্দোলনে সে একজন একনিষ্ঠ কর্ম্মী ছিল। *—* * তার পরিচয় জানান সম্ভব নয়।

খাঁড়গ্রাম নিবাসী শ্রীঅরুণ কান্তি সেন জানাচ্ছেন :—

* * * ৩০ বৎসরেরও অধিক পূর্বে এক শুভ মুহূর্ত্তে রামদার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। * * * আমরা রামদার জন্য কিছু করতে পারি না বা করিও না কিন্তু তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য সর্বদা ব্যস্ত। তিনি সকল সময় আমাদের পূর্বেই সাবধান করে দেন। আমরা আমাদের জন্য কিছুই ভাবি না, যা ভাবেন তিনিই। * * *

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পরমারাধ্য গুরুদেবের অপর এক বাল্য সাথী (বর্ত্তমান কলিকাতা নিবাসী) দীর্ঘ পত্রে বহু তথ্য জানিয়েছেন, তার সামান্য অংশ নিম্নে দেওয়া হইল।

আমার দীর্ঘ ৫৩ বৎসরের জীবনে গ্রামের উন্নয়নমূলক এবং গ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্যমূলক ইতিহাস ও পূর্ব্ব গৌরবের তথ্যানুসন্ধানে সর্বপ্রকার চিন্তায় ও কাজে আমরা সর্ব ক্ষেত্রেই এক মত পোষণ করেছি। * * * বিল্বপত্তনে ভট্টাচার্য্য বংশের আদি বাস স্থাপয়িতা মহাসাধক ভৃগুরাম স্বামীর বংশের ভারত খ্যাত পণ্ডিতদের সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানে তার নিরলস পরিশ্রমের কথা আমরা সুবিদিত। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ভট্টাচার্য্য বংশের বিভিন্ন বাড়ী হইতে জীর্ণ পুথিপত্র এবং মূল্যবান চিঠিপত্র উদ্ধার করিয়া অনেক তথ্য সংগ্রহ করে। পুথিপত্রের মর্ম্ম উদ্ধারের জন্য বহু স্থানে চেষ্টা করা হয় এবং পুঁথিগুলির গুরুত্ব সেই সময়েই উপলব্ধি করা হয়। সাধন পদ্ধতি, পূজা পদ্ধতি, গ্রহ শান্তির জন্য রত্ন, ধাতু ও কবচ ধারণ এবং কয়েকটি দুরারোগ্য ব্যাধির ঔষধেরও সন্ধান সেই সময়েই সে জানিতে পারে। *** তার পূজা পদ্ধতি আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। তারাপীঠের সাধক শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর তার ধর্মজীবনে এক বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। * * *

আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বিশেষতঃ আমার স্ত্রীর অসুখে তার কবচ ও হোম-যাগযোজ্ঞে আমি সুফল পয়েছে।

*   পরম বৈষ্ণব বংশের কন্যার সহিত পরম শাক্ত বংশের মিলনের রহস্য আমাদের জ্ঞানের সীমার উর্দ্ধে। বৌঠানের সাহায্য ছাড়া "রামকৃষ্ণের" পক্ষে ধর্ম জীবনে ও সাধন পথে এতটা উন্নতি লাভ সম্ভব হত বলে আমি মনে করি না। *   *   * রামকৃষ্ণ আমার বন্ধু। তাকে কোনদিন প্রণাম করি নাই। বন্ধুকে বন্ধুর মতই সম্বোধন করি, কিন্তু বিশেষ কয়েকটি ঘটনার পর কেন জানি না বৌঠানকে প্রণাম না করে পারি না। *   *   *

রসুলপুর নিবাসী শ্রীঅনাথশরণ নন্দী জানাচ্ছেন—

*   *   * আমার স্ত্রীর সর্বপ্রকার চিকিৎসায় ব্যর্থ হইয়া তাহাকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিতে বাধ্য হইলাম। *   * এগার মাস পরে সুস্থ হইয়া ফিরিল। জানিলাম, বড়-বেলুনের শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট কবচ ধারণ করিয়া সুস্থ হইয়াছে। *   *   * ভাইদের ইচ্ছানুসারে জমিতে জল সেচের জন্য Shallow Tubewell বসানো হইল। তাহাতে জল উঠিল না। বড়বেলুনে পত্র দ্বারা গুরুদেবকে জানান হইল। তিনি উত্তরে লিখিলেন "যেখানে Tubewell বসান হইয়াছে সেখান হইতে তুলিয়া উত্তর পশ্চিম দিকে পুনরায় বসাও, জল পাওয়া যাইবে। সেখান হইতে তুলিয়া তাহাই করা হইল। *   * তিনি আমাদের জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনা, আমাদের নিকট হইতে বহু দূরে থাকিয়াও পূর্বাহ্নেই জানাইয়া দেন। *   *   * তিনি জানাইলেন, আমাকে ব্যবসা করিতে হইবে। *   * অল্পদিন মধ্যে নিজনামে একটা আটা চাকী বসান হইয়াছে। বসতবাটী নির্মাণ করা হইয়াছে এবং একটা তেল কলও বসান হইয়াছে। *   *   *।

অনুরূপ বহু পত্রাদি সংগৃহীত হইয়াছে, স্থানাভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হইল না।

সমাপ্ত